নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

সেপ্টেম্বর ২০১৭ ■ ভাদ্র - আশ্বিন ১৪২৪

সৌজন্য সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসহাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

শিল্প নির্দেশক
সঞ্জীব কুমার সরকার

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ফিরোজ চন্দ্র বর্ধন

সহযোগী শিল্প নির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : বিজু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর আপনি কোল আলো করেছিলেন বাবা-মায়ের। আপনার বাবা, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর মা, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রথম সন্তান আপনি। বড়ো হতে হতে বাবা-মায়ের আদর্শের শিক্ষায় আপনিও হয়ে উঠলেন এই বাংলার। জাতির পিতা ঘাতকের আঘাতে শহিদ হলেন। শহিদ হলেন আপনার পরিবারের সবাই। কেবল আপনি আর আপনার ছোটো বোন শেখ রেহানা বেঁচে গেলেন।

এ বড়ো কঠিন শোক, যা আপনার বুকে জমাট বেঁধে আছে। এই দেশ আপনার পরিবারকে নিরাপদে রাখতে পারেনি। আপনি কিন্তু শোককে শক্তিতে পরিণত করলেন। বাংলাদেশকে নিরাপদ করতে যুদ্ধ শুরু করলেন। যুক্তরাষ্ট্রের এক জরিপ সংস্থা বিশ্বের নিরাপদ দেশের তালিকা করেছিল। নিরাপদ দেশ হিসেবে এশিয়ার মাঝে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে *বাংলাদেশ*।

এরকম আরো অনেক অর্জন আছে বাংলাদেশের। আপনার জন্যই সম্ভব হয়েছে এসব। আজ যোগ্য নেতা হিসেবে বিশ্বে সবাই জানে আপনাকে। সম্মানিত করে আপনার কাজকে।

আমরা গর্বিত আপনার জন্য। আপনি আমাদের মাঝে আছেন, এ আমাদের আনন্দ দেয়। আর তাই আপনার ৭১তম জন্মদিনে আপনাকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

শুভ জন্মদিন প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, শুভ জন্মদিন শিশুদের বন্ধু শেখ হাসিনা।

নিবন্ধ

০৮ চিরভাস্বর যে স্মৃতিচিহ্ন/মাহমুদুর রহমান
১০ সাইকেল চালানোর উপকারিতা/ মো. জামাল উদ্দিন
১১ সাইকেলের খুঁটিনাটি/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
১৯ সাইকেলের ইতিহাস/শাহানা আফরোজ
৩৪ সাইকেল সন্দেশ/ মেজবাউল হক
৫৬ সহজাত শিক্ষার সহজ পথ/নাজমুল হুদা

গল্প

০৪ যুদ্ধ পুরস্কার প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে/শামী তুলতুল
০৬ আর একটু বেশি ভাবো/ অনুবাদ: সালেহা চৌধুরী
১৪ সাইকেল কন্যা/মনি হায়দার
১৭ পাজা/বর্ণালী চৌধুরী
২৩ বুবলীর বাইসাইকেল কিস্‌সা/ড. শিল্পী শুভ্র
৩৬ ঘুড়ুরের হোমওয়ার্ক/ঝর্ণা দাস পুরকায়স্থ
৪০ গোলাপ/জামিউর রহমান লেমন
৪৫ এক দুপুরের গল্প/মাহবুব রেজা

সাইকেল স্মৃতি

২১ স্বাধীন বাহন সাইকেল/মুহা শিপলু জামান
২৬ লাল সাইকেল/রকিবুল ইসলাম
২৭ সাইকেলের দিঠে পড়েছিলেন আফজাল স্যার/মিজানুর রহমান মিঠুন
২৯ সাইকেল চোর/শামীম খান যুবরাজ

কবিতা

০৩ আমিরুল হক
০৫ রেবেকা ইসলাম
০৭ খোরশেদ আলম নয়ন
৪৭ আহমাদ স্বাধীন/রফিকুল ইসলাম রাফিকী/বাহারুল হক লিটন
৪৮ মিনতি বড়ুয়া/মোহাম্মদ নুর আলম গদ্দী/নজরুল ইসলাম সন্ধীপী
৪৯ বজলুর রশীদ/শাহাদাৎ শাহেদ/পারভীন আক্তার লাভলী

সাইকেল কবিতা

২৫ ওয়াসিফ-এ-খোদা/সনজিত দে
২৬ লোকমান আহম্মদ আপন

শরতের কবিতা

৫০ নীহার মোশারফ/আখতারুল ইসলাম/সানোয়ার শান্তি

ছোটোদের লেখা

২৮ আমার সাইকেল চালানো ও ভবিষ্যৎ চাওয়া / নিতু চৌধুরী
৩১ সাইকেলের আফসোস/অভ্র ফারিহা
৩৩ চার চাকার সাইকেল/ইন্তিসার ইমরান (রাইসা)
৫১ দেখে এলাম হিমালয়/শাকিরা মারুফ মুগ্ধ
৫৩ করিমুল্লার গাছগুলো/আনিশা রহমান (বন্যা)
৫৫ আমার লাল সাইকেল/নবনিল আহমেদ

ছোটোদের ছড়া

২২ জেরিন আক্তার
৫৪ সালমান সাকিব/ফাতেমা জান্নাত/জাহিদ সজল/ লাবিবা তাবাসসুম রাইসা

প্রতিবেদন

৫৭ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার মাধ্যম সুলতানা বেগম
৫৮ সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে খন্দকার আনিজা হোসেন জন্নাতে রোজী
৬০ শিশু একাডেমি থিয়েটার: অবাক জলপান প্রসেনজিৎ কুমার দে

ছোটোদের আঁকা

৬১ মিনহাজুল আবেদীন সিয়াম/সমৃদ্ধি বিশ্বাস শ্রেয়সী
৬২ বনি হাওলাদার/মরিয়াম চৌধুরী জয়িতা
৬৩ রামিছা নুজহাত খান/নিখিল দাস
৬৪ মাকনুন মুরছাহা/ইসরা তাসকিন অস্মিতা

সাফল্য

৬৬ তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ / সাদিয়া ইফফাত আঁখি

ইউরোপে বাইসাইকেল রপ্তানিতে তৃতীয় হয়েছে বাংলাদেশ। পোশাকের মতো সাইকেলও আন্তর্জাতিক বাজার দখল করছে। আর বাংলাদেশের ভেতরই দিনকে দিন বাড়ছে সাইকেলওয়ালার সংখ্যা। আনন্দের খবর এই যে, সাইকেল চালাতে পিছিয়ে নেই মেয়েরাও। দূরের স্কুলে পড়তে যেতে, মা'কে পেছনে বসিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে, বাবা আর সাইকেলকে সঙ্গী করে কৃষি বীজ কিনতে যায় কন্যারা। এরা সাইকেল কন্যা। এদের সাইকেল ওড়ে 'পাখা'র মতো। সাইকেল এখন এগিয়ে চলার সাথি। সাইকেল নিয়ে হরেকরকম গল্প-কবিতা আর মজার মজার তথ্য জানো এবারের সংখ্যায়। আর হ্যাঁ, এসব তোমার কেমন লাগল, জানাতে ভুলো না কিন্তু।

১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। এই দিনে বাবা-মায়ের কোল আলো করে পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জ্যেষ্ঠ সন্তান, সবার আদরের 'হাসু'। বড়ো হয়ে হলেন শেখ হাসিনা।

আজ সারা পৃথিবীর মানুষ তাঁকে চেনে। বাংলাদেশকে গড়ে তুলছেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে এই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বিস্ময়।

নতুন বাংলাদেশের কারিগর শেখ হাসিনা'র ৭১তম জন্মদিনে নবারুণ-এর খুদে বন্ধুদের পক্ষ থেকে রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

চাঁদের কণা শেখ হাসিনা

আমিরুল হক

আশ্বিনের এক সোনালি দুপুরে
টুঙ্গিপাড়া গ্রামে
জন্ম নিল চাঁদের কণা
শেখ হাসিনা নামে।

চাঁদের কণা শেখ হাসিনা
জন্ম নেওয়ার পর
ফুল সুবাসে ভরল সেদিন
বাবা-মায়ের ঘর।

ঘরে খুশি বাইরে খুশি
খুশি চতুর্দিক
দিনের সূর্য রাতের চন্দ্র
করে যে ঝিকমিক।

শিউলি কাশফুল শাপলা বকুল
ফুল প্রকৃতির মেলায়
নিত্য কাটে তাদের সাথে
কণার ছোট্ট বেলায়।

ধীরে ধীরে বড়ো হয় সে
ধুলো মাটি মেখে
গ্রামবাংলার আলো হাওয়া
প্রাণ প্রকৃতি দেখে।

টুঙ্গিপাড়ার চাঁদের কণা
ছোট্টটি আর নয়
মেধা-মনন-গুণ ও জ্ঞানের
রাখেন পরিচয়।

চাঁদের কণা শেখ হাসিনার
সহজ সরল মন
তাই তো তাঁকে ভালোবাসে
দেশের জনগণ।

যুদ্ধ পুরস্কার প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে

শাম্মী তুলতুল

বাবা জানো আজ একটা বিশেষ দিন। তোমার, আমার, সবার জন্য। কিন্তু কি সেটা মামনি এখনো বলেনি। জানো বাবা, মা বলেছে তুমি অনেক বড়ো যোদ্ধা ছিলে। বড়ো বড়ো বন্দুক দিয়ে যুদ্ধ করেছিলে। দেশের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলে। যুদ্ধ করে দেশকে রক্ষা করেছিলে। আমাদের একটা স্বাধীন দেশ দিয়েছিলে। যার নাম বাংলাদেশ। যেখানে এখন আমরা স্বাধীনভাবে বসবাস করছি।

মামনি বলেছে, যুদ্ধ করা অনেক কষ্ট। মামনি মুক্তিযুদ্ধের সব ইতিহাস আমাকে খুলে বলেছে। আমিও কিন্তু কম সাহসী নই বাবা।

আমাদের স্কুল গেটের সামনে একজন বুড়ো লোক প্রতিদিন বসে থাকেন। বেচারা পেলে খায়, না পেলে উপোস থাকে। তার চুলগুলো উশকোখুশকো। সে সবসময় ছেঁড়া কাপড়চোপড় পরে থাকে। তার জন্য আমার অনেক মায়া হয়। স্কুলের ছেলেপুলেরা তাকে পাগল বলে খেপায়। তার গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারে। আমার দেখে খুব কষ্ট হয়। কান্নাও পায়। তাই একদিন তোমার মতো ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার লম্বা স্কেলটা হাতে নিয়ে ওদের দেখিয়ে বললাম, দেখো তোমরা যদি এই বুড়ো মানুষটাকে মারো, আমি তোমাদের আব্বু-আম্মুকে বলে দেবো। টিচারকে বলে দেবো। তখন তোমরা বকা খাবে। শাস্তিও পাবে। চলে যাও বলছি।

আমার কথা শোনা মাত্রই ভয় পেয়ে ওরা দিল ভোঁ-দৌড়। আমি হি হি করে হাসতে লাগলাম। সেই থেকে ওরা আর বুড়ো লোকটার ধারে কাছেও আসে না। এভাবে আমি শত্রুদের কাছ থেকে বুড়ো লোকটাকে রক্ষা করি বাবা। মামনি বলেছে, অনেক

শত্রু দেশে রয়ে গেছে। তাদেরকেও দেশ থেকে তাড়াতে হবে। বড়ো হয়ে আমিও দেশের জন্য কাজ করব। দেশের শত্রুদের রুখব।

অনেকক্ষণ যাবৎ তুলির মা তুলির পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবার ছবির সঙ্গে কথা বলতে দেখে বুকটা তার মোচড় দিল। কাঁদতে লাগলেন তিনি।

হঠাৎ মায়ের কান্নার শব্দ শুনতে পেল তুলি। পিছন ফিরে মাকে বলল, মামনি, ও মামনি তুমি কাঁদছ কেন?

মা বলল, এত খুশির কান্না। গর্বের কান্না। তোমার বাবার বদলে আজ তুমি পুরস্কার নিবে।

কিসের পুরস্কার?

তোমার বাবাকে আজ মুক্তিযোদ্ধার সম্মাননা দিবেন। শুধু তোমার বাবাকে নয় আজ আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে পুরস্কার দিবে সরকার। যারা যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিলেন। আর যারা বেঁচে আছেন তাদের সবাইকেও। আর এই পুরস্কার কে হাতে তুলে দেবে জানো?

কে মা?

আমাদের দেশনেত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শত্রুরা নির্মমভাবে উনার স্বজনদের গুলি করে হত্যা করেছিল। তাই স্বজন হারানোর বেদনা উনার চাইতে কেউ ভালো বুঝবেন না।

সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে পড়েছি। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা।

হুম। বঙ্গবন্ধুই সেদিন অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এতদিন প্রধানমন্ত্রীকে শুধু টেলিভিশনে দেখেছি। আজ তাহলে সরাসরি দেখব। তাই না মামনি?

হ্যাঁ মা। নিশ্চয়। তিনি আমাদের দেশ ও দেশের মানুষকে সুখী রাখার জন্য, তাঁর বাবার মতো দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

আজ আমার অনেক খুশি লাগছে মামনি। প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে যুদ্ধ পুরস্কার নেব। চাট্টিখানি কথা নয়। কাল স্কুলে বন্ধুদের গর্বের সঙ্গে বলতে পারব।

অবশ্যই। এখন চল আর দেরি করা যাবে না অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে।

এই বলে তুলি আর তুলির মা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল।

যেতে হবে অনেক পথ

রেবেকা ইসলাম

শ্যামলা বরণ গাঁয়ের মেয়ে নাকে রুপোর নথ
স্কুলে সে যাচ্ছে হেঁটে অনেক অনেক পথ
মাঠ পেরিয়ে ঝোপ এড়িয়ে বাড়ছে সময় বেলা
যাচ্ছে সাথে সাদা তুলো মেঘের ঢেউয়ের মেলা।

আকাশ পানে উড়ে গেল দুটো শালিক জোড়
হঠাৎ বুনো কাঠবিড়ালি চমকে দিল দৌড়
তেঁতুল ছড়া ছড়িয়ে আছে নীরব তেঁতুলতলায়
কোনো কিছু বাধ সাধে না শ্যামলা মেয়ের চলায়।

বটের পাতা বলছে, তোমায় দেব কোমল ছায়
হলদে ঢেউয়ের সরিষা ক্ষেত ডাকছে কাছে আয়
ফিসফিসিয়ে বলছে কথা সবুজ বাঁশের বন
কোনোদিকে সেই মেয়েটার যায় না কোমল মন।

ক্ষেতের মাঝে কাকতাড়ুয়া হাসছে যেন খুব
বিলের জলে জলপিপিটা আস্তে দিল ডুব
গোমড়ামুখো হুতোমপ্যাঁচার কিসের এত শোক?
যাচ্ছে না তো সেই মেয়েটার সে ছবিতেও চোখ।

বাবা বলেন, পড়তে হবে যেতে হবে দূরে
প্রতিবেশীর ভিন্ন কথা অন্যরকম সুরে
সামনে এসেও মা দাদিজান আবার পিছু হটে
শঙ্কা মনে কী জানি কী নানান কথা রটে ?

সেই মেয়েটার একটি স্বপন একটি স্বাধীন মত
বাধা ভেঙে যেতে হবে অনেক অনেক পথ।

অনুবাদ গল্প

আর একটু বেশি ভাবো

মূল : এনিড ব্লাইটন

ভাষান্তর: সালেহা চৌধুরী

প্লাশ নামের খেয়া পারাপারের মাঝি নদীর ধারে ছোটো এক বাড়িতে বাস করত। একটা সুন্দর নৌকা ছিল তার। নৌকার রং ছিল নীল আর নৌকা বাইবার বৈঠার রং ছিল হলুদ। নৌকার নাম – চল যাই। ওই নৌকাতে নদীর এপার থেকে ওপারে যাওয়া যেত।

প্লাশ খুব ব্যস্ত থাকত সারাদিন। ও পোস্টম্যানকে চিঠি বিলি করতে নদীর ওইপারে নিয়ে যেত। মিসেস ডাম্বল যখন বাজারে যেত তাকে নদীর এপার আর ওপার করত ও। যে চারটি ছেলে নদী পার হয়ে স্কুলে যেত তাদেরও নদী পারাপার করত।

ও যখন নৌকায় পারাপার করত, আপনমনে গান করত।

যখন বলত 'চল এখন' তখন খুব জোরে বৈঠা দিয়ে পানিতে আঘাত করত, আর খুব জোরে পানিতে ঢেউ তুলে নৌকা চলত। সবাই ওর এভাবে নৌকা চালানো পছন্দ করত।

কেবল মিসেস ডাম্বল বলতেন, এমন করলে তার কাপড় ভিজে যায়। ও কোনোদিন কাউকে বলেনি – আমি তোমাকে নিতে পারব না। যখন মস্ত বড়ো এক জাদুকর বলেছিল পার করে দিতে তাকেও পার করেছিল। তবে ভয়ে কাঁপছিল অল্প অল্প। প্লাশের মনে হয়েছিল যদি এই যাদুকর নৌকা ডুবিয়ে দেয় তাহলে কী হবে। ও কোনোমতে জাদুকরকে ওপারে নিয়ে গিয়েছিল। ও সকলকে বলে – আমি কখনো কাউকে না করিনি। কিন্তু একবার ও প্রায় বলেই ফেলেছিল – না। আমি পারব না। যখন ডাইনি গ্রিম বলেছিল – তোমার জন্য কিছু জিনিস রেখে গেলাম, ঠিকমত ওপারে নিয়ে যাবে। ও বুঝতে পারছিল না জিনিসগুলো কী। বলেছিল ডাইনি গ্রিম – খুব সাবধানে পারাপার করাবে। যদি এটা পার করতে কোনো ক্ষতি হয় তোমাকে সুদে-আসলে সে টাকা দিতে হবে। না হলে তোমার এই নীল নৌকা আমি নিয়ে চলে যাবো।

কী সে জিনিস? আর কখন দেবে তুমি?

আজ সন্ধ্যায় মিস্টার কুইক জিনিসগুলো আনবেন। দুটো প্রাণী আর এক বস্তা মুলো।

মিস্টার কুইক সন্ধ্যাবেলায় জিনিসগুলো এনেছিল। ও তখন নদীর ওইপারে। মিস্টার কুইক চিৎকার করে বলেছিল– তাড়াতাড়ি আসো। জিনিসগুলো নাও। আমি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবো না। ও তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বলেছিল– কী সব জিনিস তোমার?

একটা লাল শেয়াল। একেবারে জীবন্ত। দাঁতগুলো ঝকঝক করছে।

একটা ছোটো সাদা খরগোশ।

আর এক বস্তা মূলা। আর সেই মূলা দেখেই খরগোশের ক্ষুধা যায় বেড়ে। আর খরগোশ দেখে শেয়ালের।

কুইক চলে গেল। প্লাশ বলে – আমি এখন ভীষণ ক্লান্ত। একজন একজন করে নিতে হবে আমাকে। কাকে আমি প্রথমে নেব?

খরগোশ বলে – আমাকে আগে নাও। ওই শেয়াল দেখে আমার খুব ভয় করছে। এরপর আমাকে নিরাপদে রেখে মূলা নিও।

একটু ভেবে প্লাশ বলে – দাঁড়াও দেখি ভাবতে দাও। আমি তোমাকে প্রথমে নেব তারপর মূলা নিয়ে রেখে আসব। তুমি তো সব মূলা খেয়ে ফেলবে।

তাহলে আমাকে আগে নাও। বলে শেয়াল। তারপর খরগোশ নাও।

ও তা কেমন করে হবে। আমাকে নিয়ে শেয়ালের সঙ্গে রেখে আসবে? তখন শেয়াল তো আমাকে খেয়ে ফেলবে। শেয়াল বলে –এক কাজ কর তুমি আমাকে নিয়ে যাও। তারপর মূলা নিয়ে যাও। প্লাশ ভাবছে। কী করবে ও। মূলা যদি রেখে আসে তাহলে ওকে নিতে হবে শেয়ালকে। আর শেয়াল আর মূলা রেখে আসার আগে খরগোশ আর শেয়াল থাকবে একসঙ্গে। তখন কী হবে।

শেয়াল বলে– খুব করে ভাবো তারপর দেখো কী হয়।

প্লাশ ভাবতে ভাবতে বলে– পেয়েছি কী করে এর সমাধান করা যায়।

শেয়াল বলে– পেয়েছো সমাধান? বলো তাহলে কী করে?

বলে আমি দেখাচ্ছি কী করে সমাধান করা যায়।

এই বলে ও প্রথমে খরগোশকে নিয়ে যায় ওপারে। প্লাশ খরগোশকে ওপারে রেখে আসে। এরপর ও ফিরে আসে। এরপর মূলা তুলে নেয় নৌকাতে। শেয়াল বলে – মূলা আর খরগোশ? তাহলে ওর একটাও থাকবে না।

প্লাশ কোনো কথা বলে না। ও ফিরে আসার সময় খরগোশকে সঙ্গে করে আনে। এরপর ও খোরগোশকে রেখে শেয়ালকে তুলে নেয় নৌকাতে। বলে – খরগোশ তুমি থাকো। আমি শেয়ালকে নেব। এপারে খরগোশ একা বসে থাকে। প্লাশ শেয়ালকে ওপারে নিয়ে যায়। এরপর নৌকা বেয়ে চলে আসে এপারে। শেয়াল আর মূলা তখন ওপারে। শেয়াল কোনোদিন মূলা খায় না। তখন ও খরগোশকে তুলে নেয় নৌকায়।

খরগোশ ওপারে যায়। শেয়াল একা পায় না খরগোশকে। খরগোশ একা পায় না মূলাকে। সত্যি অনেক ভেবে প্লাশ এইভাবে তিনজনকে ওপারে নিয়ে যায়।

ডাইনি গ্রিম বলে – তোমাকে আমি পুরস্কার দেবো। তুমি সত্যিই খুব বুদ্ধিমান।

একটু বেশি ভাবলে যে-কোনো সমস্যারই সমাধান হতে পারে।

সবুজ শ্যামল দেশ

খোরশেদ আলম নয়ন

কোথায় পাবে এই অপরূপ স্বপ্ন-রঙিন দেশ
ঝলমলানো সুনীল আকাশ শ্যামল পরিবেশ।
ফুলের মুখে মিষ্টি হাসি পাখির ঠোঁটে গান
নদীর বুকে ঢেউ দোলানো হাওয়ার কলতান।
পাতায় পাতায় রয় ছড়িয়ে আবির রঙের ছায়া
সাঁঝ আকাশে জড়িয়ে থাকে রূপকথারি মায়া।
মন ভরানো মাঠের ফসল রাতে তারার মেলা
ফুল পাখি আর চাঁদ-জোনাকির কী অপরূপ খেলা।
দিঘির বুকে কলমিলতার তিরতিরানো দোলা;
দেশের ছবি দেখতে আমি দু'চোখ রাখি খোলা।

চিরভাস্বর যে স্মৃতিচিহ্ন

মাহমুদুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর সাইকেল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরীর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা চালানোর জন্য তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমার জৌকুড়া গ্রামের মনাক্কা চেয়ারম্যানের বাড়িতে আসেন। সে সময় ঐ বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই ওয়াজেদ মন্ডল। সঙ্গী ছিল নতুন কেনা সাইকেল। বাড়ির উঠানে রাখা সাইকেলটি রোদের আলোয় ঝলঝল করছিল।

আলাপের ফাকেঁ হঠাৎ বঙ্গবন্ধুর চোখ পড়ে উঠানে লিচুগাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখা সাইকেলের ওপর। বঙ্গবন্ধু মোনাক্কার কাছে জানতে চাইলেন, 'সাইকেলটি কার?' সাইকেলের মালিক কাছেই দাঁড়ানো ছিল পরিচয় পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর বললেন, 'তোর সাইকেলটি কয়েকদিনের জন্য আমাকে দে। রাজবাড়ির ওয়াজেদ চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত থাকবি। সেখানে তোর সাইকেল আমি ফেরত দেবো।' এরপর ১০/১২ সঙ্গী নিয়ে ঐ সাইকেলে চড়ে গ্রামের পর গ্রাম চষে বেড়ালেন, বঙ্গবন্ধু আর ভোট চাইলেন। এদিকে ওয়াজেদ মন্ডল রাজবাড়িতে গিয়ে ওয়াজেদ চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে থাকতে শুরু করলেন। পনেরো দিন পর বঙ্গবন্ধু সাইকেল ফিরিয়ে দিয়ে কাছে টেনে বললেন, 'ভালো থাকিস। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করিস। আর মানুষকে ভালোবাসতে শিখিস। পারলে রাজনীতি করিস।' সেই থেকে বঙ্গবন্ধুর ভক্ত ও তাঁর রাজনীতির কর্মী বনে গেলেন ওয়াজেদ মন্ডল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ধানমন্ডির বাড়িতে প্রথম দেখাতেই বঙ্গবন্ধু তার কাছে সেই সাইকেলের কথা জানতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, আমি মরে গেলে সাইকেলটি জাদুঘরে দিয়ে দিস। এরপর থেকে ২০১৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত ওয়াজেদ মন্ডল বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন এ সাইকেল। শত ঝড়-ঝাঞ্ঝায়ও আঁকড়ে আছেন স্মৃতির চিহ্ন। প্রথম দেখেই ভক্ত হয়ে যাওয়া ওয়াজেদ মন্ডলের জীবনের শেষ চাওয়া ছিল সাইকেলটি জাদুঘরে দেওয়া। তাঁর আশা পূরণে প্রায় ৬০ বছর পর জাতির পিতার ব্যবহৃত সাইকেলটি ২০১৪ সালে জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনের জন্য নিয়ে আসেন। বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরে সাইকেলটি সংরক্ষিত আছে।

মধুপুর গ্রামের এক সময়ের অবস্থাপন্ন কৃষক উমেদ আলীর একমাত্র ছেলে ওয়াজেদ মন্ডল। এক বছর বয়সে মাতৃহারা হন। তাই তাঁর সব আবদারই পূরণ করতেন বাবা। যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে মাত্র বয়স চৌদ্দ তখন ছেলের শখ মিটাতেই বাবা কিনে দেন ইংল্যান্ডের ডানলপ কোম্পানির বিএসএ মডেলের এ সাইকেলটি। ২২০ টাকায় ফরিদপুর শহরের সাইনোফোন নামের দোকান থেকে কিনেছিল ওয়াজেদ মন্ডল।

শেখ রাসেলের সাইকেল

বঙ্গবন্ধু পরিবারের সবচেয়ে ছোটো সদস্য শেখ রাসেল। জন্মেছিল ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর। জন্মের পর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের স্নেহ-ভালোবাসায় টইটম্বুর হয়েই বেড়ে উঠছিল। কিন্তু বাবার সান্নিধ্য তেমন পেত না। কারণ বাবা বঙ্গবন্ধু তখন ব্যস্ত দেশ আর রাজনীতি নিয়ে। মাসের পর মাস কাটত জেলে বন্দি অবস্থায়। তাই বাবার আদরের অভাব প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করত শেখ রাসেল। তার মায়াভরা দুচোখ সবসময় খুঁজত বাবার হাসিমাখা মুখ। কাউকে কিছু না বললেও প্রায়ই তার মন খারাপ থাকত। মায়ের দৃষ্টি কিছুই এড়ায় না। মা ফজিলাতুন নেছা মুজিব রাসেলের মনের অবস্থা বুঝে নেয়। আর তাই মন ভালো করার জন্য কিনে দেন একটি তিন চাকার সাইকেল। সাইকেল পেয়ে খুব খুশি হয় রাসেল। যদিও সাইকেলটি তার চেয়ে একটু বড়ো ছিল। তবু ছোটো দুই পায়ে পেডেল চেপে দিনময় ব্যস্ত সময় কাটত তার। টুং টাং শব্দ তুলে বাড়ির উঠোনের এক কোনা থেকে আরেক কোনায় ছিল তার ভ্রমণ। মাঝে মাঝে বাড়ির সামনের রাস্তায় গেলেও বেশি দূর যেত না। অবশ্য আরেকটি ছোটো মোটরসাইকেলও তার সংগ্রহে ছিল। শেখ রাসেলের সাইকেলের কথা অনেক সময় উঠে এসেছে তার আপনজনদের স্মৃতিকথায়। 'শেখ রাসেল' নামের বইটিতে স্মৃতিচারণে শেখ হাসিনা লিখেছেন-

রাসেলের একবার অ্যাকসিডেন্ট হলো। সেদিনটার কথা মনে পড়লে এখনও গা শিউরে ওঠে। রাসেলের একটা ছোট মপেট মোটরসাইকেল ছিল আর একটি সাইকেলও ছিল। ও কখনও কখনও সাইকেল নিয়ে রাস্তায় চলে যেতো। পাশের বাড়ির ছেলেরা ওর সঙ্গে সাইকেল চালাতো। আদিল ও ইমরান দুই ভাই এবং রাসেল একই সঙ্গে খেলা করতো। একদিন মপেট চালাবার সময় রাসেল পড়ে যায় আর ওর পা আটকে যায় সাইকেলের পাইপে। বেশ কষ্ট করে পা বের করে। আমি বাসায় উপরতলায় জয় ও পুতুলকে নিয়ে ঘরে বসে। হঠাৎ রাসেলের কান্নার আওয়াজ পাই। ছুটে উত্তর-পশ্চিমের খোলা বারান্দায় চলে আসি, চিৎকার করে সকলকে ডাকি। এর মধ্যে দেখি কেউ একজন ওকে কোলে করে নিয়ে আসছে। ওর পায়ের অনেকখানি জায়গা পুড়ে গিয়ে বেশ গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। ডাক্তার এসে ঔষুধ দিল। অনেকদিন পর্যন্ত পায়ের ঘা নিয়ে কষ্ট পেয়েছিল।

শেখ রাসেল এখন স্মৃতি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তাকেও চলে যেতে হয়েছে না ফেরার দেশে। কিন্তু আজো বেঁচে আছে তার প্রিয় সাইকেল জোড়া। বন্ধুরা ইচ্ছে করলে তোমরা দেখে আসতে পারো সেই সাইকেল দুটোকে। ধানমন্ডির ৩২ নং রোডের বাড়ির দোতালায় উঠলেই দেখতে পাবে ডাইনিং টেবিল আর বঙ্গবন্ধুর শোবার ঘর। ডাইনিং টেবিলের ঠিক পেছনে সযতনে রাখা আছে রাসেল সোনার সাইকেল দুটো। একটু কান পাতলেই বাড়ির নির্জনতায় শুনবে সাইকেলের শব্দ টুং টাং টুং...

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট ও পত্রপত্রিকা

সাইকেল চালানোর উপকারিতা

মো. জামাল উদ্দিন

পরিবেশ উপযোগী বাহন হিসেবে সাইকেলের জুড়ি নেই। আবার শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশেও রয়েছে এর বিরাট ভূমিকা।

হার্ট ভালো রাখতে সাইকেল চালানোর বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাই হার্ট ভালো থাকে। হাই ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের সমস্যা প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে সাইক্লিং। সাইক্লিং ওজন কমিয়ে, হেলদি ওয়েট মেইনটেন করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে যাদের একটু ওজন বেশি তাদের জন্য ম্যাজিকের মতো কাজ করে সাইক্লিং। নিয়মিত সাইকেল চালালে হজমশক্তি বেড়ে গিয়ে বাড়তি ওজন ঝরে যায়।

সমস্ত শরীরের সব অংশের ওপর সমান প্রভাব পড়ে। সাইকেল চালানোর আর একটি সুবিধা হলো, নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম মানতে হয় না। সাইকেল চালানোর সময় কোমর, শরীরের নিম্নাংশ, পায়ের মাসলেরও ব্যায়াম হয়, যা জমে থাকা মেদ ঝরিয়ে ফেলতে সাহায্য করে। যদি নিয়মিত সাইকেল চালানো তোমরা প্রতিদিনের ব্যায়াম রুটিনে শামিল করতে পারো, তাহলে নিজেই তফাতটা বুঝতে পারবে। মেদহীন ঝরঝরে শরীরের সঙ্গে মেজাজও ফুরফুরে থাকবে। ক্লান্তিও দূর হবে।

শরীর ভালো রাখতে সঠিক খাওয়া দাওয়া যতটা জরুরি, ঠিক ততটাই জরুরি নিয়মিত ব্যায়াম করা। ফিট এবং হেলদি থাকার জন্য গোসল, খাওয়া, ঘুমের মতোই ব্যায়মকেও প্রতিদিনের জীবনে সামিল করতে হবে।

প্রতিদিন হয়তো ব্যায়াম করতে ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু তাই বলে মাঝে মাঝে দুই-একদিন ব্যায়াম করা বাদ দেওয়া যাবে না। তোমার রুটিন এমনভাবে সাজাও যাতে ব্যায়াম কখনোই বোরিং মনে না হয়। আর ভারী ব্যায়াম হিসেবে বেছে নিতে পারো সাইক্লিং। অন্য যে-কোনো ব্যায়ামের চেয়ে সাইক্লিং অনেক ভালো ব্যায়াম। সাইকেল চালালে পুরো শরীরের ব্যায়াম হয়। হাত থেকে শুরু করে পা, কাঁধ ও শরীরের বাকি অংশ একটা নির্দিষ্ট ছন্দে থাকে।

বেশি স্পিডে সাইকেল না চালিয়ে সেটিকে আনন্দের সাথে চালাতে চেষ্টা করো। কারণ ব্যায়াম যদি উপভোগ না করো, তাহলে কিন্তু কাজ মনে হবে। সাইক্লিংয়ে স্ট্যামিনা বেড়ে যায়, সকালে যদি আধ ঘণ্টা সাইকেল চালাতে পারো, তাহলে সারাদিন মেজাজটা থাকবে ফুরফুরে। সকল কাজে এনার্জি পাবে। তবে সাইকেল চালাতে হবে নিয়মিত। একদিন-দুদিন সাইকেল চালালে কিন্তু কোনো লাভ হবে না। সপ্তাহে অন্তত ৩-৪ দিন তো বটেই। সকালে বা বিকেলে সুবিধামতো সময়ে সাইকেল চালাতে পারো।

মনে রাখবে উচ্চতা অনুযায়ী সঠিক মাপের সাইকেল নিতে হবে। সিটের লেন্থ, তোমার সুবিধা মতো অ্যাডজাস্ট করে নেবে।

সাইক্লিং হলো সাঁতারের পর সবচেয়ে ভালো ব্যায়ামগুলোর একটি। সাঁতারের মতোই সারা শরীরে ব্যায়াম হয় সাইক্লিং করলে, কিন্তু শরীরের নিচের ভাগের একটু বেশি হয়, যা পেট মোটা হওয়া কমাতে সাহায্য করে। বিশেষ করে উরুর চর্বি কমে, ফুসফুসের শক্তি বৃদ্ধি করে, হৃদরোগের সম্ভাবনা কমায় এবং ভারসাম্য রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সঠিক পদ্ধতিতে সাইকেল চালানো জরুরি। চালানোর আগে অবশ্যই শরীর ওয়ার্ম-আপ করে নিতে হবে। অন্তত ১৫-২০ মিনিট যদি একই গতিতে চালাতে পারো, তা ৫ মিনিট খুব জোরে চালানোর থেকে ভালো। আর এই গতি ধীরে ধীরে বাড়ানোর চেষ্টা করলে আরো ভালো। প্রতি ২০ মিনিট চালানোর পর ৫ মিনিট হালকা গতিতে চালিয়ে বিশ্রাম নেয়া ভালো। সাইক্লিং -এর পর বসে আগে ঠান্ডা হয়ে তারপর গোসল করা ভালো। সাথে সাথে গোসল করলে ঠান্ডা লাগতে পারে।

শিশু সাইকেল চালালে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সবচেয়ে বড়ো কথা শহরের এই ক্লান্তিকর পরিবেশে সাইকেল শিশুদেরকে বাড়তি আনন্দ জোগাবে।

সাইকেলের খুঁটিনাটি

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

শুরুতেই বলি বাইসাইকেল হচ্ছে দুই চাকা বিশিষ্ট পায়ে চালানোর একটি বাহন। একে বাংলায় শুধু সাইকেল বলে অভিহিত করা হয়। এতে কোনো মেশিন থাকে না। তবে আধুনিক কিছু বাইসাইকেলে মেশিনের ব্যবহার দেখা যায়। দুই চাকার এই দারুণ যানটি চলে কিন্তু তেল-পানি ছাড়াই। সবচেয়ে বড়ো কথা এটি পরিবেশ বান্ধব একটি যান। বন্ধুরা, সাইকেল বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জেনে নাও—

সাইকেল আবিষ্কার কাহিনি

তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এত জনপ্রিয় একটি বাহন যাকে ছোটো-বড়ো সবাই পছন্দ করে, সেই বাহনটির আবিষ্কার কোথায়? কে এটিকে বানিয়েছেন? তবে সাইকেল আবিষ্কারের দাবিদার অনেকেই। ইতিহাস বলছে, প্রথম দুই চাকার বাহন আবিষ্কার করেন জার্মানির কার্ল বন জ্যারন নামে এক ব্যক্তি ১৮১৭ সালে। তিনি তাঁর আবিষ্কার করা বাইসাইকেলটি সর্বপ্রথম জনসম্মুখে আনেন জার্মানির শহর ম্যানহেম-এ। এটি কাঠের ফ্রেমের সাথে কাঠের দুটি চাকা লাগিয়ে এক ধরনের বাহন তৈরি করেছিলেন। এটি পুরোপুরি সাইকেলের মর্যাদা পায়নি। তবে ১৮৬০ সালের প্রথম দিকে ফরাসি পিতা পুত্র পিয়েরে ও আরনেস্ট মাইকক্স সর্বপ্রথম পায়ে চালিত বাইসাইকেল আবিষ্কার করেন।

নানা ধরনের সাইকেল

সাইকেল মোটামুটি ছয় ধরনের হতে পারে। যেমন- ট্যারিং, মাউন্টেইন, হাইব্রিড বা ক্রস, ইউটিলিটি, রেসিং এবং স্পেশিয়ালিটি। সমান রাস্তায় চলার জন্য তোমরা ট্যুরিং বাইসাইকেল ব্যবহার করবে। পাহাড়ি ঢালু আর উঁচুনিচু রাস্তায় চলতে চাই মাউন্টেইন বাইক।

কোথায় পাবে ভালো সাইকেল

সাইকেল বা সাইকেল বিষয়ক যে-কোনো জিনিসের জন্য সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য স্থান পুরান ঢাকার বংশাল। দেশি-বিদেশি সব ধরনের সাইকেল পাওয়া যায় এখানে। এছাড়া গুলশান, উত্তরা, মিরপুর, পান্থপথে রয়েছে বেশ কিছু সাইকেলের শোরুম। সাইকেল কেনার সময় দোকান বা কোম্পানি থেকে ছয় মাস বা এক বছরের ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়। সেই ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সাইকেল কেনার সময় ভালোভাবে জেনে নিও। তবে সাইকেলের কোনো সমস্যা হলে সেটি সারানোর ব্যবস্থাও বংশালেই ভালো রয়েছে।

কত দামে পাওয়া যাবে শখের সাইকেলটি

সাইকেলের নানা ব্র্যান্ড ও বৈশিষ্ট্যের উপর এর মূল্য নির্ভর করে। বিদেশি ব্র্যান্ডের সাইকেল কিনতে চাইলে দামটা একটু বেশিই পড়বে। যেমন- আপল্যান্ডের দাম ২০-৬০ হাজার টাকা, ট্রেকের দাম ৩০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকার মতো আর মেরিডার দাম ১৮ থেকে ৫০ হাজার টাকার মধ্যে। দেশি ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে মেঘনা গ্রুপের স্টিল ফ্রেমের সাইকেল পাওয়া যাবে ৭-১১ হাজার টাকার মধ্যে। অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের সাইকেলের দাম ১২ থেকে ৫০ হাজার টাকার মধ্যে। মেঘনা গ্রুপের ভ্যালোস, টেলাস, ডায়মন্ডব্যাক, কোর, রয়্যাল ইত্যাদি

ব্র্যান্ডের সাইকেল ১৩ থেকে ৩০ হাজার টাকায় পাওয়া যাবে। দেশি ব্র্যান্ডের সাইকেল বর্তমানে তরুণদের মাঝে বেশি জনপ্রিয়।

সাবধানতা

শখের সাইকেল নিয়ে যাতে বিপত্তিতে না পড়ো তাই কেনার আগেই কিছু বিষয় দেখে নেবে। যেমন- গিয়ার, ফ্রেম, ডুয়াল, সাসপেনশন, ব্রেক, সিট, টায়ার, চেইন এসব দেখে শুনে বুঝে নিবে সাইকেল কেনার আগেই। এছাড়া সাইকেলের সঙ্গে হেলমেট, গ্লাভস, স্ট্যান্ড, ফ্রন্ট লাইট এসবও একসাথে কিনে নেওয়া ভালো। প্রথমদিকে সাইকেল নিয়ে উত্তেজনাটাও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। হুট করেই হাইওয়ে বা বড়ো রাস্তায় না গিয়ে নিজের নিয়ন্ত্রণে আশপাশের এলাকায় চালাতে হবে।

বাইসাইকেল চালানোর নিয়ম জেনে তবেই সাইকেল চালাতে হবে। সাইকেল চালানোর সময় কার্যক্ষমতা, সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কিছু উপায়ের মধ্যে প্রথম হচ্ছে হেলমেট পড়তে হবে। কারণ কোনো প্রকার দুর্ঘনায় ব্রেইনের ক্ষতি হওয়া থেকে বাঁচার জন্য হেলমেট ৯০% কার্যকরী।

নতুন সাইকেল কেনার ক্ষেত্রে

নতুন সাইকেল কিনতে গিয়ে নিজের শরীরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিনতে হবে। নিজের শরীরের মাপের সাথে মিলে যায় এমন সাইকেল কেনার জন্য দুই পা ফাঁকা করে এমনভাবে দাঁড়াবে যাতে নিজের পায়ের পাতা মাটির সাথে সমান থাকে। মাউন্টেন বাইকে কমপক্ষে দুই ইঞ্চি ফাঁকা থাকবে।

মেয়েদের জন্য সাইকেল

আনুপাতিক হারে মেয়েদের পা লম্বা আর শরীর ছোটো, একই উচ্চতার কোনো ছেলের তুলনায়। এজন্য মেয়েদেরকে তার শরীরের গঠনের সাথে যে-সব সাইকেল ডিজাইন করা হয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। তাছাড়া যেসব সাইকেল মেয়েদের জন্য ডিজাইন করা থাকে সেগুলোর টব টিউব হ্যান্ডলবারগুলো সরু থাকে। আর এর বসার গদিগুলোও মেয়েদের বসার উপযোগী করে তৈরি হয়। তবে সাইকেল চালাতে শুধু গায়ের জোর খাটালেই হবে না। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সবাইকেই জানতে হবে যথাযথ সাইকেলের সুনিশ্চিত ব্যবহার।

সাধারণ কিছু টিপস

গ্রীষ্মের গরম আবহাওয়ায় তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে সাইক্লিং করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। স্বাভাবিক আবহাওয়ার চেয়ে গরম বা ঠান্ডা আবহাওয়ায় সাইকেল চালানোর কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। গবেষণায় দেখা যায়- সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত প্রচণ্ড গরম থাকে ফলে এই সময়টুকু সাইক্লিং করতে সতর্ক করা হয়। সাইকেল চালানোর সময় রাস্তা নির্বাচন একটি বড়ো বিষয়।

গরম আবহাওয়াতে সাইকেল চালানোর পরিশ্রমের ফলে শরীর থেকে প্রচুর ঘাম নির্গত হয়। সে সঙ্গে লবণ বের হয়ে যায়। ফলে শরীর পানিশূন্য হয়ে যেতে পারে। তাই গরমে সাইকেল চালালে অবশ্যই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পানি বা স্যালাইন সম্ভব হলে গ্লুকোজ পানি পান করতে হবে।

গ্রীষ্মে সাইক্লিং-এর সময় হালকা ধরনের কাপড় পড়বে যাতে দ্রুত শুকিয়ে যায় ও ভিতরে সহজে বাতাস ঢুকতে পারে। এক্ষেত্রে পলিস্টার কাপড়ের ফুল স্লিভ গেঞ্জি অথবা হাফ স্লিভ গেঞ্জির সাথে পলিস্টার স্লিভ হ্যান্ড কভার পড়তে পারো। সুতি কাপড় ঘাম শোষণ করে শরীরের সাথে লেপ্টে থেকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হতে পারে তাই সাইকেল চালানোর সময় সুতি কাপড় না পড়াই ভালো।

রাতে সাইকেল না চালানোই ভালো। কারণ রাতে নানা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যদি কেউ রাতে সাইকেল চালাও তবে উজ্জ্বল রঙের এবং প্রতিফলন ঘটে এমন কাপড় পড়তে হবে।

তোমরা যদি অনেক যানবাহন ও ট্রাফিকের মধ্যে একটি চিকন বা ঢালু রাস্তা দিয়ে চলাচল করো তবে সবসময় গাড়ির লেন দিয়ে চলবে, সাইড দিয়ে চালাবে না, সাইডে চালালে তোমাকে দেখা নাও যেতে পারে তখন হয়ত কোনো গাড়ি এসে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারে।

সঠিক সময়ে ব্রেক চাপ দেওয়া পারদর্শী হওয়ার জন্য দুই হাত একদম লেভেলের শেষে রাখতে হয়। তাড়াতাড়ি থামানোর জন্য দুই হাত দিয়ে ব্রেক চেপে সিট থেকে নেমে যাবে। এর ফলে পিছনের চাকা নিচু থাকবে এবং উলটে পড়ে যাবে না।

গরমের দিনে সাইক্লিং গ্লাস রোদ ও ধুলাবালি থেকে চোখকে রক্ষা করবে।

আছাড় না খেয়ে, হাত-পা না ছিলে এবং ব্যথা না পেয়ে কেউ সাইকেল চালাতে শিখতে পারে না। তাই পড়ে গেলে ভয় পাবে না। ভয়কে দূর করে বার বার চেষ্টা করতে হবে। তবে সেফটি গিয়ার যেমন- নী গার্ড, এলবো গার্ড, হেলমেট এবং গ্লাভস ব্যবহার করবে। এগুলো মেজর ইনজুরি থেকে বাঁচাবে। তবে ধৈর্য হারিয়ে এ জিনিস আমার দ্বারা হবে না বলে রেখে দিলে চলবে না। মনে রাখবে কুকুরকে ট্রেনিং দিলেও সাইকেল চালাতে পারে। আর আমরা তো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। আমরা কেন পারবো না।

বন্ধুরা, সাইকেল সম্পর্কে এতকিছু জানার পর তোমাদের কি ইচ্ছে করছে না সাইকেল চালিয়ে পাখির মতো উড়ে বেড়াতে। সাইকেল শুধু তরুণ তরুণীদের জন্য নয় অফিসগামীদের জন্যও জরুরি। কারণ সকালে যথাযথ সময়ে অফিসে পৌঁছাতে সাইকেলের কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর অনেক উন্নত শহরেই সাইকেল ব্যক্তিগত বাহন হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ঢাকা বা ঢাকার বাইরেও এখন বাইসাইকেল বেশ জনপ্রিয়। কারণ সাইকেল পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না। এটি চালাতে কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স লাগে না। সাইকেল চালালে শরীরের পেশিগুলোর ভালো ব্যায়াম হয়। এটি রাখতে গ্যারেজের বড়ো জায়গা লাগে না। জায়গা না থাকলে ঘরের ভেতরেই রেখে দেওয়া যায়। এছাড়া সাইকেল নিয়ে যে-কোনো যানজট পাড়ি দেওয়া সম্ভব।

সাইকেল নিয়ে 'ভালোবাসার বিডি সাইক্লিস্ট' বাংলাদেশের তরুণরা সাইকেলকে ভালোবেসে বিডি সাইক্লিস্ট নামে একটি কমিউনিটি গড়ে তুলেছে। সেই কমিউনিটির উদ্যোগেই সম্প্রতি হয়ে গেল বিশ্ব রেকর্ডের এক অসাধারণ প্রচেষ্টা। তোমাদের হয়ত জানতে ইচ্ছে করবে বিডি সাইক্লিস্ট এর প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলাদেশে সাইকেল বিপ্লবের পুরোধা কে? সে হচ্ছে মোজাম্মেল হক। ২০১১ সালের ১৭ মে মূলত প্রতিষ্ঠা হয় বিডি সাইক্লিস্ট-এর। প্রথম এর সসদ্য ছিল ২০-২২ জন। বর্তমানে প্রায় ৩৮ হাজার সদস্য রয়েছে এ গ্রুপে। তোমরা চাইলে বিডি সাইক্লিস্ট এর ওয়েব সাইটের রেজিস্ট্রেশন লিং bdcyclist.com /register -এ গিয়ে ফরমটা ফিলাপ করে বিডি সাইক্লিস্ট এর ফেইসবুক গ্রুপে মেম্বার হয়ে যেতে পারো। তোমরা সাইকেল সম্পর্কে অনেক কিছু জানলে। আরো কিছু জানার থাকলে বিডি সাইক্লিস্ট-এ যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানতে পারবে।

আর সাইকেল চালাবে আনন্দ ও মজা করে, নিজেকে খেয়াল রেখে

গল্প

সাইকেল কন্যা

মনি হায়দার

বেহুলা, ওই বেহুলা।

বিকেল। রান্নাঘরের নিচে বেহুলা সাইকেল পরিষ্কার করছে। বেহুলার মা মরজিনা বেগম পুকুরে থালা বাটি ধুচ্ছে। বাবা আসমান আলী মাত্র খেয়ে বিছানায় শরীর এলিয়েছে। চিংড়ি মাছ দিয়ে বেগুনের চচ্চড়ি দারুণ মজা লেগেছে। মজা পেয়ে একটু বেশিই খেয়েছে। তৃপ্তির হাই তুলে বিছানায় গড়াগড়ি খায় আসমান আলী।

মরজিনা থালা ধুইতে ধুইতে মাথা তোলে, ওই বেহুলা? দেখত কেডায় ডাকতাছে?

বেহুলার বাপ বাড়ি আছো? ও বেহুলার বাপ?

বিছানা ছাড়ে আসমান আলী। উঠোনে নেমে দেখে উজানগাও মাদ্রাসার বড়ো হুজুর কেরামত মিয়া। সঙ্গে তিনজন ছাত্র আর পাশের বাড়ির ছবেদ মুনসী। আসমান আলী একটু অবাক, আরে হুজুর আপনে? কী মনে কইরা? বসেন।

আসমান ভাই, বইতে আসি নাই। একটা জরুরি কতা কইতে আইছি আপনার লগে।

আমার লগে জরুরি কতা?

মাথা নাড়ায় বড়ো হুজুর কেরামত মিয়া, হ আপনার লগেই জরুরি কতা।

কী জরুরি কতা?

আপনার মাইয়া বেহুলা তো না- জায়েজ কাম করতেছে।

কী কন আপনে?

আমি যা কই, ঠিকই কই। হেই না-জায়েজ কামের লগে আপনে, আপনার বৌও জড়াইয়া যাইতেছেন।

হুজুর, আপনার কতা কিছুই বুঝতে পারছি না।

পাশ থেকে কথা বলে ছবেদ মুনসী, আপনার মাইয়ায় সাইকেল চালায় না?

মাথা নাড়ে আসমান আলী, হ আমার মাইয়া বেহুলা সাইকেল চালাইয়া স্কুলে যায়। স্কুল থেকে বাড়ি আসে। ক্যান, কী অইচে?

আপনে জানেন না, মাইয়া মাইনষে পর্দায়

থাকবে। সাইকেল চালানো তো মহা গুনা।

সাইলেক চালানো গুনা? আসমান আলী নিজের মনে বলে।

হ, মস্ত বড়ো গুনা। বেহুলারে কইয়া দেবেন আর সাইকেল না চালাইতে।

আমি চালামু সাইকেল– উঠোনের সবাই ঘুরে তাকায়। বেহুলা দাঁড়িয়ে আছে চৌচালা ঘরের ছায়ায়। পিছনে মরজিনা বেগম। মাথায় ঘোমটা। বেহুলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে উঠোনের সবাই। ক্রোধে জ্বলে উঠছে বড়ো হুজুরের চোখ। পাশে দাঁত খিলাল করছে ছবেদ মুনসী। মাদ্রাসার ছাত্রদের মুখ ভাবলেশহীন।

হোনলেন হুজুর, বেত্তমিজ মাইয়ার কতা হোনলেন? আপনার মুহের উপর কতা কয়?

আসমান আলী, উজানগাও গেরামে থাকতে অইলে আমার কতা মানতে অইবে। না মানলে, শরিয়তের বরখেলাপ করলে গেরাম দিয়া বাইর কইরা দিমু। আসমান আলীর চোখে চোখ রেখে বলে বড়ো হুজুর। কথাটা যেন মনে থাহে। এই আহো তোমরা– হনহন করে চলে যায় সবাই বড়ো হুজুরের পিছু পিছু।

বেহুলা সারা বিকেল মুখ ভার করে থাকে। আসমান আলীও থম ধরে বসে থাকে। বিকেলে বোথলা বাজারে যাবার কথা ছিল, যায় না। বাড়ি এসে এইভাবে অপমান করে গেল? কিচ্ছু করতে পারব না? আসমান আলী বুঝতে পারে, এই ঘটনার পিছনে ছবেদ মুনসীই সব নাটের লাটাই। বেহুলা তার একমাত্র মেয়ে। বড়ো দুই ছেলে রিমু আর চপল খুলনায় পড়াশুনা করে। বেহুলা গ্রামের বাড়িতে থেকে সিক্সে পড়ে। দেখতে শুনতেও ভালো। ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেয়েছে। পরীক্ষা দিয়ে বড়ো ভাই আর মামাদের বাসা খুলনায় গিয়েছিল। সেখানে বড়ো মামার সাইকেল নিয়ে চালাতে শুরু করে। দু-দিনের মধ্যে বেহুলা চমৎকার সাইকেল চালানো শিখে যায়।

বড়ো মামা বলেন, বেহুলা, তুই তো সাইকেল চালানো শিখে গেলি। ফাইভে বৃত্তি পেলে তোকে সাইকেল কিনে দেবো।

সত্যি দিবা?

মামা হাসেন, দিবো।

বৃত্তি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলে বেহুলা সত্যি বৃত্তি পায়। বেহুলা মোবাইলে বড়ো মামাকে রেজাল্ট জানায়। বড়ো মামা হাসেন, রিমুর কাছে আগামী মাসে সাইকেল পাঠিয়ে দেবো। মামা সুন্দর একটা সাইকেল পাঠিয়েছে পরের মাসে। সাইকেল পেয়ে বেহুলা আকাশে উড়তে থাকে। সারাদিন উঠোনে সাইকেল চালায়। বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সাইকেলে চড়িয়ে ঘুরায়। পুরো এলাকায় সাড়া পরে গেছে। বেহুলার নামও ছড়িয়ে পরে মুখে মুখে। কম কথা? গ্রামের একটা মেয়ে সাইকেল চালায়!

পরের দিন থেকে বেহুলা সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যায়। স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে ছবেদ মুনসীর ছেলে নাদের মুনসী দেখে বেহুলাকে। নাদের মুনসী কচা নদীতে ছান্দি জালা বায়। ছবেদ মুনসী বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। মরজিনা বেগম প্রায় তেড়ে আসে, আমার মাইয়ারে আমি এহন বিয়া দিমু না। আমার মাইয়া লেহাপড়া কইরা অনেক বড়ো অইবে। হেরপর বিয়া।

রাতের হেরিকেনের আলোয় ঘরের মধ্যে তিনজন মুখোমুখি। মরজিনা বেগম বলে, এত ভয় পাইলে চলবে? চলবে না। যেখানে মুশকিল সেখানে আছান। হোনেন রিমুর বাপ, মুই মোর মাইয়ারে লেহাপড়া শিখামুই।

কেমনে শিখাইবা? সাইকেল তো একটা বাহানা। বেহুলা স্কুলে গেলে পথে ঝামেলা করবে।

মুই বেহুলারে বরইতলা মোর বাপের বাড়ি পাঠামু। মায়ের লগেও কতা অইচে। আরো সুবিধা অইবে। বেহুলার নানা বাড়ির লগে স্কুল। কালই বেহুলারে লইয়া যাইবেন।

সত্যি মা? বেহুলার মুখে হাসি ফোটে।

মেয়েকে কোলে টেনে নেয় মরজিনা, সত্যি না তো মিত্যা কমু ক্যান মোর মাইয়ার লগে? আমি তো মা বকলম। মোর বাপ-মায়ে মোরে লেহাপড়া শিহায় নাই। মুই মোর মাইয়ারে বকলম রাখমু না।

বেহুলা বরইতলা হাই স্কুলে নতুন করে সিক্সে ভর্তি হয়। স্কুলের বার্ষিক খেলাধুলায় সাইকেল চালনায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। ভাণ্ডারিয়া উপজেলা পর্যায়ে বিজয় দিবসে মেয়েদের সাইকেল চালানো প্রতিযোগিতায় ও প্রথম হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান নিজের হাতে পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা আর একটা মেডেল দেয়। উপজেলা চেয়ারম্যান আসমান আলীকে বলে, আপনার মেয়েটার সাইকেল চালানো বন্ধ করবেন না। বেহুলাকে বড়ো বড়ো প্রতিযোগিতায় পাঠাবেন। ও আমাদের উপজেলার মান রাখবে।

পরের বছর পিরোজপুর জেলা সাইকেল চালানোয় উজানগাওয়ের মেয়ে প্রথম হয়। পুরস্কার পায় দশ হাজার টাকা। আর মেডেল। খবর পৌঁছে যায় উজানগাওয়ের স্কুলে। সেভেনের ছাত্রছাত্রীরা যায় প্রধান শিক্ষক কবিরউদ্দিনের কাছে। ক্লাসের ক্যাপটেন বিমল রায় বলে, স্যার বেহুলা তো আমাদের সঙ্গে পড়ত।

জানি তো। আসল কথা বলো।

বেহুলা ওর নানা বাড়ি বরইতলা স্কুলের ছাত্রী হিসেবে উপজেলা, জেলায় সাইকেল চালিয়ে প্রথম হয়। সব সুনাম চলে যায় বরইতলা স্কুলে। অথচ বেহুলা আমাদের উজানগাওয়ের মেয়ে। আমাদের স্কুলে থাকলে ওর সুনামের অংশ হতো এই গ্রাম।

প্রধান শিক্ষক কবিরউদ্দিন মৃদু হাসেন, তো আমি কী করতে পারি?

বেহুলাকে ফিরিয়ে আনেন।

বেহুলা কেন উজানগাও গ্রাম, উজানগাও স্কুল ছেড়ে গেছে, জানো?

জানি।

তো এখন যদি বেহুলাকে ফিরিয়ে আনতে হয়, তোমাদের একটা কাজ করতে হবে। কেবল সেভেন ক্লাস নয়, সিক্স, এইট, নাইন, টেন– সব ক্লাসের ছাত্রদের এক হতে হবে। এক হয়ে তোমরা প্রায় এক হাজার ছাত্র আছ। রাস্তায় নেমে মিছিল করবে, বলবে- উজানগাওয়ের স্কুলে বেহুলাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কী পারবে না?

ক্লাস সেভেনের সবাই মাথা ঝাঁকায়, খুব পারব স্যার।

যাও, অন্যদের ম্যানেজ করো। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।

ক্লাস সেভেনের ছেলে-মেয়েরা স্কুলের সব ক্লাসের ছাত্রদের বোঝায়। সবাই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামায়, আরে তাই তো! আমাদের গ্রামের মেয়ে বেহুলা। অথচ উপজেলা, জেলার লোকেরা জানে ও বরইতলা গ্রামের মেয়ে। না, এটা অন্যায়। এই অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না। উজানগাও হাই স্কুলের ছেলে-মেয়েরা স্কুলের মাঠে একত্র হয়। প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেন। আর মনে মনে গর্ব অনুভব করেন।

ক্লাস টেন যেহেতু হাই স্কুলের বড়ো ক্লাস। নেতৃত্ব চলে যায় ক্লাস টেনের ক্যাপটেন ঝিমলুর কাছে। ঝিমলুর মারদাঙ্গা শরীর। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। বিমল রায়ের মন খারাপ হয় একটু। কিন্তু আনন্দ হচ্ছে, বেহুলা গ্রামের মেয়ে আবার গ্রামে ফিরবে। উজানগাও স্কুলে পড়বে। আমাদের ক্লাসেই পড়বে। ওর কত নাম! সবাই ওকে চেনে এক নামে- বেহুলা? সাইকেল চালায় যে মেয়েটা?

স্কুলের মাঠ থেকে মিছিল রাস্তায় নামে। হাজার শিশু-কিশোরের উদ্দাম স্রোতে ভেসে যায় সকল অনাচার। ঝিমলু ঝাঁকড়া চুলে দোল দিয়ে, ডান হাত উঁচু করে স্লোগান ধরে, উজানগাওয়ের বেহুলাকে...। সবাই উত্তর ধরে, ফিরিয়ে আনো, আনতে হবে। উজানগাওয়ের লোকজন অবাক। সবাই ঘটনাটা জানে। কিন্তু ভয়ে কিচ্ছুটি বলতে পারছিল না। সেই সব ছেলে-বুড়োরাও রাস্তায় নেমে আসে স্কুলের শিশুদের সঙ্গে। গ্রামের মেঠো পথে এমন মিছিল কেউ কখনো দেখেনি। শোনেনি এমন স্লোগানও। স্কুলের মাঠ ছাড়িয়ে গ্রামের পথে মিছিল ঢুকে গেছে। মিছিল যত ভেতরে যায়, তত বড়ো হয় আকার।

দুপুরে বড়ো হুজুর কেরামত মিয়ার দাওয়াত ছিল ছবেদ মুনসীর বাড়ি। মুরগির সালুন দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে ঢেকুর তুলছিল বড়ো হুজুর। স্লোগান শুনে রাস্তায় আসে। দেখে ফেলে বড়ো হুজুর আর ছবেদ মুনসীকে উজানগাও স্কুলের ছেলে-মেয়েরা। সবার সামনে ঝিমলু। ঝিমলু বড়ো হুজুর আর ছবেদ মুনসীকে দেখে বলে, ধর।

দুজনে দৌড় শুরু করে। পেছনে একদল শিশু কিশোর। দৌড়ে এদের সঙ্গে পারে না বড়ো হুজুর আর ছবেদ মুনসী। সামনে পড়ে একটা খাল। দুজনে ঝাঁপ দেয় খালে। ছেলে-মেয়েরা ঢিল ছুড়ে মারতে থাকে। দুজনে প্রাণ নিয়ে সাঁতরে ওপারে ওঠে।

ঝিমলু বলে, ওপারে থাকো বাছাধন। আর এপারে আসবা না।

পরের দিন বরইতলা থেকে উজানগাওয়ে, নিজের গ্রামে সাইকেল চালিয়ে ফিরে আসে বেহুলা। ওর গলায় দুটো মেডেল। উজানগাও স্কুলের ছেলে-মেয়ে, শিক্ষকেরা রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকে, আর মরজিনা বেগমের কন্যা, বেহুলা বিজয়ীর মুকুট পরে সাইকেল চালাতে থাকে। মাসখানেকের মধ্যে উজানগাওয়ের শিউলি, ফরিদা, অর্চনা, দীপালী, আঁখি, বিন্দুরা সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যায় সারিবদ্ধভাবে।

মনে হয় উজানগাও গ্রাম- সাইকেলের গ্রাম।

পাখা

বর্ণালী চৌধুরী

বড্ড ঝামেলা করছে বিনুর সাইকেলটা আজ। বার বার চেইনটা পড়ে যাচ্ছে। মনে হয় আজ স্কুলে দেরি হয়ে যাবে। ধ্যাত!

চেইনটা ঠিক করতে গিয়ে আঙুলে কালো ময়লা লেগে গেল আবার। মনে মনে সাইকেলটাকে বকা দিল। আঙুল মোছার জন্য কিছু একটা খুঁজতে এদিক-ওদিক তাকালো। হ্যাঁ, পাতা দিয়েই মোছা যাবে হাত। পথের ধারে বুনো আঙুর লতার ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল ও।

একমুঠো পাতা ছেঁড়ার জন্য টান দিতেই সরসর করে কিছু একটা গড়িয়ে গেল যেন। হ্যাঁ, ঐ তো নিচে গড়িয়ে যাচ্ছে। গড়াতে গড়াতে সাদা প্লাস্টিকের বস্তাটা বড়ো গাছের গুঁড়িটার সাথে আটকে গেল। বিনু কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। কার না কার জিনিস কে জানে। মা বলেন, অন্যের জিনিস না বলে ধরবে না। কিন্তু এখানে কেউ তো নেই। কার জিনিস, কী জিনিস, কীভাবে বুঝবে।

মনে মনে ভাবল, বস্তাটা যে এখানে রেখেছে সে যদি খুঁজে না পায়! হাত মুছতে একমুঠো পাতা ছিঁড়তে গিয়েই তো গাছে নাড়া লেগে ওটা গড়িয়ে আরো নিচে চলে গেল। অন্তত বস্তাটা যেখানে ছিল সেখানে উঠিয়ে রাখা ওর উচিত। ভাবতে ভাবতে ও গর্ত মতো জায়গাটাতে নামার চেষ্টা করল। বেশ খানিকটা কসরত করে লতা জঙ্গল সরিয়ে তবে নামতে পারল। বস্তার মুখটা শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। কী আছে কে জানে? বাঁধা জায়গাটা মুঠি করে ধরে বস্তাটা টেনে ওপরে তোলার চেষ্টা করল।

হঠাৎ সাইকেলের বেলের শব্দ। সেই সাথে নিজের নাম ধরে কেউ ডাকছে মনে হলো। বিনু ও বিনু। কোথায় গেলি এভাবে সাইকেলটা ফেলে? বিনুর সাইকেলটা কমবেশি সবার চেনা। লাল-সবুজ রঙের সাইকেল শুধু বিনুরই আছে। সেই সাথে লাল-সুবজ ফিতের ঝুঁটিবাঁধা হ্যান্ডেল। সামনে প্লাস্টিকের ছোট্ট একটা লাল-সবুজ পতাকা। আর বিনুর সাইকেলের নামটাও সবার জানা। পাখা।

শিলার গলা আরো কাছে শুনতে পেল। ঝোঁপের আড়াল থেকে বস্তাটা টেনে তুলতে তুলতে বিনু উত্তর দিল। শিলা, এই তো এখানে আমি। এদিকে আয়, আমার হাতটা একটু ধর তো। শিলা বিনুর এক হাত ধরে বস্তাসহ বিনুকে রাস্তায় উঠতে সাহায্য করল।

শিলা, এটা কিরে বিনু? বিনু, আমি জানি না রে। হাত মোছার জন্য একমুঠো পাতা ছিঁড়তে গিয়েই ওটা গড়িয়ে আরো নিচে পড়ে গেল। ভাবলাম কার না কার জিনিস তুলে রাখি। তবে বস্তাটা বেশ ভারি মনে হচ্ছে শিলা, বিনু বলল।

শিলা একটু কৌতূহলী হলো। মুখটা খোল তো কী

আছে দেখি। এভাবে কেউ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে কেন? আশপাশে তো কাউকেই দেখছি না। ঠিক বলেছিস, বলল বিনু। দুজনে মিলে বস্তার মুখ খুলতেই ওদের চোখ ছানাবড়া! বস্তার মধ্যে কালো পাথরের একটা মূর্তি। দুজনেই একটু ঘাবড়ে গেল। ভয়ে এদিক-ওদিক তাকালো কাউকে পায় কি না। না, ধারে কাছে কাউকেই পেল না।

বিনু বলল, চল স্কুলে নিয়ে যাই। হেডস্যারকে বলে এটার একটা ব্যবস্থা করা যাবে। বিনু সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখল আর শিলা বস্তাটা ওদের দুজনের মাঝখানে রেখে শক্ত করে ধরে বসল। ওরা কিছু দূর এগিয়ে নিঝুর দোকান পার হতেই দেখল, দুজন লোক ওদের বস্তাটা লক্ষ্য করছে। শিলা পিছনে তাকাতেই দেখল লোক দুটো দ্রুত পায়ে হেঁটে ওদের দিকেই আসছে। শিলা বিনুকে বলল, দ্রুত চালিয়ে যা, লোক দুটো আমাদের ফলো করে এগিয়ে আসছে। এটা ওদেরই কাজ। বিনুর মনে পড়ল, আজ সাইকেলটা বড্ড জ্বালাতন করেছে, যদি চেইনটা আবার পড়ে যায় তাহলে ঐ লোক দুটো ওদের ধরে ফেলবে। সামনের রাস্তাটা বেশ নিরিবিলি। বিনু একহাতে পাজ্ঞার গায়ে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে বলল, পাজ্ঞা তুই তো বুঝতে পারছিস কত ঝুঁকি নিয়ে দেশের সম্পদ রক্ষা করতে যাচ্ছি। তুইও এই কাজে একজন সাহায্যকারী। কোনোভাবে যেন থেমে না যাই পাজ্ঞা, কোনো ভাবে যেন হেরে না যাই। পাজ্ঞাও যেন বিপদ আঁচ করতে পারল। চেইনে কচকচ শব্দ তুলে যেন জানিয়ে দিল, ভয় নেই, ভয় নেই। পিছনে লোক দুটো কিছুটা হেঁটে কিছুটা দৌড়ে ওদের ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করল। দ্রুত সাইকেল চালিয়ে বিনু স্কুলের সীমানায় পৌঁছে গেল। শিলাও শক্ত করে ধরে থাকল বস্তাটা।

মাঠে সবাই জড়ো হয়েছে। থানা থেকে ওসি সাহেব আর ইন্সপেক্টরও এসেছেন। এসএমসির সভাপতি, সদস্যরাও এসেছেন। জানা গেল, তিনদিন আগে পাশের গ্রামের ষষ্ঠীতলা পূজামণ্ডপ থেকে কষ্টিপাথরের কালী মূর্তিটি চুরি হয়েছিল। সবাই বিনু আর শিলাকে ওদের বুদ্ধিমত্তা আর সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানালো। বিনুকে কিছু বলার জন্য হেডস্যার হ্যান্ডমাইকটা এগিয়ে দিলেন। বিনু বলল, আসলে সবকিছু ঐ পাজ্ঞাই করেছে, ঠিক যেখানে মূর্তিটা ছিল সেখানেই পাজ্ঞার চেইন পড়ল, হাতে ময়লা লাগা, পাতা ছেঁড়া, মূর্তির বস্তা গড়িয়ে যাওয়া, আবার পাজ্ঞার জন্যই ঐ মূর্তি পাচারকারীদের পিছনে ফেলে দ্রুত স্কুলে আসা, সব তো পাজ্ঞাই করে দিল। আমার পাজ্ঞাও এ কাজে একজন সাহায্যকারী। যাবার সময় ওসি সাহেব বললেন, বাহ্ বিনু তোমার লাল-সবুজে সাজানো সাইকেল পাজ্ঞা তো সামনে এগিয়ে যাবার প্রতীক!!

সাইকেলের ইতিহাস

শাহানা আফরোজ

একটি শিশু যখন হাঁটতে শিখে তখন তার বাবা মার কাছে প্রথম বায়না থাকে সাইকেল কিনে দেওয়ার। শিশুটি যদি চালাতে নাও পারে তবু যেন একটি সাইকেল তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো চাওয়া হয়। শুধু শিশু নয় দুরন্ত শৈশব-কৈশোরেরও ছুটে চলার একমাত্র বাহন সাইকেল হোক তা গ্রামে বা শহরে। বিনা খরচে দ্রুত পথ চলা ও শারীরিক ব্যায়ামের ক্ষেত্রে সাইকেলের বিকল্প নেই। সাইকেলের রয়েছে আরও অনেক উপকারিতা। এই বাহনটি খুবই সহজলভ্য, নেই পরিবেশ দূষণের ভয়, এছাড়াও নেই মারাত্মক কোনো দুর্ঘটনার ভয়। সাইকেল যার আরেক নাম বাইসাইকেল। সাইকেল শব্দটি ইংরেজি শব্দ, যার বাংলা অর্থ 'দ্বিচক্রযান'। আমরা বর্তমানে সাইকেলগুলো যেমন অবয়বের দেখি এগুলো পূর্ব থেকেই এরূপ ছিল কিন্তু তা নয়।

আজকের সাইকেলের অবয়বের সাথে পূর্বের সাইকেলের ছিল অনেক পার্থক্য। অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের পর আমরা আজকে এমন সুন্দর সাইকেল চালাতে পারছি।

১৮১৬ সালে সর্বপ্রথম জার্মানিতে সাইকেলের উদ্ভব হয়। সে সময় সাইকেলের কোনো প্যাডেল, গিয়ার, টায়ার, চেইন ইত্যাদি যন্ত্রাংশ ছিল না। সর্বপ্রথম সাইকেল উদ্ভাবক কার্ল ভন ডেভিস ১৮১৭ সালে তার বিশাল রাজকীয় বাগানের ভিতর দ্রুতগতিতে চলাচলের জন্য কাঠ দিয়ে একটি সাইকেল তৈরি করেন। ১৮১৮ সালে সর্বপ্রথম তার তৈরিকৃত সাইকেল প্যারিসে জনসম্মুখে নিয়ে আসেন। প্যাডেলহীন এই সাইকেলের সিটে বসে মাটিতে পা লাগিয়ে ঠেলে ঠেলে চালাতে হতো। এজন্য ইংল্যান্ডে ব্যঙ্গ করে সাইকেলকে বলা হতো 'ডান্ডি হর্স' বা শৌখিন বাহন। সর্বপ্রথম এই সাইকেলের চাকা ছিল তিনটি। এরপর ১৮৬০ সালে প্যাডেল জুড়ে দেয়া হয় সাইকেলে। তবে চাকার সংখ্যা তিন থেকে কমিয়ে একটিতে নিয়ে আসা হয়। ফলে নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যে, এই সাইকেল সবাই চালাতে পারতো না। যারা চালাত পারতো তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখা হতো এবং তাদের অনেক কৃতিত্বপূর্ণ লোক বলে মনে করা হতো। এক চাকার এই সাইকেলগুলোকে ইউনি সাইকেল বলা হতো। তখন সার্কাসের শোগুলোতে এই সাইকেল ব্যবহার করা হতো। আজও বিশ্বব্যাপী সার্কাস শোতে এই সাইকেল ব্যবহার করা হয়।

১৮৬১ সালে প্যাডেল লাগানো হলেও সেটিতে চেইন লাগানো ছিল না। প্যাডেল ছিল সামনের চাকায়। আর এর চাকা ছিল লোহার তৈরি, ফলে রাস্তায় চলার সময় ঝনঝন শব্দ হতো। সাইকেলের এই ঝনঝনানি শব্দের কারণে তখন এটির নাম দেয়া হয় 'বান শেকার'। এর বছর দশেক পরে বাজারে আসে এরিয়েল নামের নতুন এক ধরনের সাইকেল। যে সাইকেলেরও প্যাডেল ছিল সামনের চাকায় এবং এর সামনের চাকা ছিল পিছনের চাকার চেয়ে অনেক বড়। স্বীকৃত ইতিহাস হলো ফ্রান্সের পিয়ের মিশো এবং যুক্তরাষ্ট্রের পিয়ের লালেমেন্ট এই দুজন প্রথম প্যাডেল চালিত সাইকেল আবিষ্কার করেন। ১৯৬৬ সালে তারা তার দেশে সাইকেল আবিষ্কার হিসেবে স্বীকৃতি পান।

এরপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের সাইকেল তৈরি হতে থাকে। কারোও সামনের চাকা বড়ো, কারও

পিছনের চাকা বড়ো, কারও বসার জায়গা নিচে আবার কারও বসার জায়গা অনেক উপরে। বিভিন্ন ধরনের সাইকেল আবিষ্কার হলেও সাইকেলগুলো চালানো সহজতর হচ্ছিল না। ওই সময় কিছু কিছু সাইকেলের চাকা ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু ছিল। ১৮৮০ সালে সর্বপ্রথম সাইকেলের দুই চাকা সমান পর্যায়ে নিয়ে আসা হয় এবং চেইন ও টায়ার লাগানো হয়। তবে টায়ারে হাওয়া ভরা থাকতো না। মেয়েদের জন্য এই সময় তৈরি করা হয় ভিন্ন এক ধরনের সাইকেল। ১৮৮৮ সালে টায়ারে সর্বপ্রথম হাওয়া ঢুকানোর ব্যবস্থা করা হয়। এর মাধ্যমে সাইকেলের আধুনিক যুগের সূচনা হয়। নতুন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সাইকেল চালানোয় স্বাচ্ছন্দ্য তৈরি হয়। ফলে বিশ্বব্যাপী সাইকেলের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশ্বে সাইকেল উৎপাদনের জন্য তৈরি হয় নতুন নতুন কোম্পানি। আর তাই এই সময়কে 'গোল্ডেন এজ অব বাই সাইকেল' বলা হয়।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৮৯৭ সালে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হয় ২০ লক্ষ সাইকেল। ১৯৩০ সালে আবারও সাইকেলের গঠনে আনা হয় কিছু পরিবর্তন। সেই থেকে সাইকেল চলে আসছে এক ঐতিহ্যবাহী বাহন হিসেবে। ১৯৪০ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত নানা সময়ে সাইকেলে যুক্ত করা হয়েছে ফ্যাশন নির্ভর বিভিন্ন উপাদান ও যন্ত্রাংশ। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ডিজাইনের সাইকেল দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ সাইকেল, হ্যান্ডেল সোজা সাইকেল, রেসিং সাইকেল, গিয়ার সাইকেল সহ বিভিন্ন সাইকেল আছে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী। তবে সকল সাইকেলের মাঝে মূল কাঠামোটাকে অবিকৃত রাখা হয়েছে।

মাথায় ফুটবল নিয়ে সাইকেল চালিয়ে রেকর্ড

মাগুরার আব্দুল হালিম। আজ ফুটবল জাদুকর হিসেবে পরিচিত। ইতোমধ্যে মাথায় ফুটবল নিয়ে সাইকেল চালিয়ে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে তৃতীয়বারের মতো গিনেস বুকে নাম লিখিয়েছেন তিনি।

২০১১ সালের ২২ অক্টোবর ফুটবল মাথায় নিয়ে ১৫ দশমিক ২ কিলোমিটার হেঁটে তিনি প্রথম গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুকে নাম লেখান। পরে ২০১৫ সালের ২২ নভেম্বর ফুটবল মাথায় নিয়ে ২৭ দশমিক ৬৬ সেকেন্ডে রোলার স্কেটিংয়ে এক'শ মিটার পথ অতিক্রম করে দ্বিতীয় বিশ্ব রেকর্ড গড়েন তিনি।

সর্বশেষ গত ৮ জুন দুপুর ১১টা ৫৩ মিনিটে শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপেক্সে বল মাথায় নিয়ে সাইকেল চালানো শুরু করেন আব্দুল হালিম। টানা ১৩.৭৪ কিলোমিটার অতিক্রম করে দুপুর ১টা ১২ মিনিট পর্যন্ত বল মাথায় রাখেন তিনি।

পৃথিবীর সবচেয়ে দামি সাইকেল

গাড়ি নির্মাণকারী সংস্থা বুগাত্তি। নতুন একটি বাইসাইকেল বাজারে এনেছে যার দাম ৪০ হাজার মার্কিন ডলার, অর্থাৎ বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩২ লাখ ২৪ হাজার টাকা। এর ওজন মাত্র ১১ পাউন্ড, অর্থাৎ পাঁচ কেজি। তার ফলে প্যাডেলে ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করেই চালানো যায় এই সাইকেল। তার জন্য কোনো অতিরিক্ত পরিশ্রমই বোধ হয় না আরোহীর।

এই সাইকেল আসলে রিইনফোর্সড কার্বন দিয়ে তৈরি। চেনের বদলে রয়েছে রাবার বেল্ট। এই বেল্টও সাইকেলের তীব্র গতির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে জানানো হয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সাইকেল

সম্প্রতি ৫২ বছর বয়েসি কিউবার নাগরিক ফেলিক্স র‍্যামন গুইরোলা সেপেরো বানিয়েছেন বিশেষ এ সাইকেলটি। তার এ সাইকেলের উচ্চতা প্রায় তিন মিটার। সাধারণত কোনো সিগন্যালে দাঁড়াতে হলে তিনি আশপাশের কোনো বাসের ছাদে হাত দিয়ে দাঁড়ান। এতে ড্রাইভার অসুবিধা বোধ করলে কোনো দেয়াল বা উঁচু কিছু ধরে ফেলেন।

স্বাধীন বাহন সাইকেল

মুহা শিপলু জামান

মানব সভ্যতার অন্যতম আবিষ্কার হলো চাকা, আর সাইকেল হলো দুই চাকার যান যা মানুষের ভ্রমণ ও সংবাদ আদান-প্রদানকে খুব সহজ করেছে। সেই সাইকেল নিয়ে কিছু স্মৃতিকথা তুলে ধরছি। তখন আমি ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র। আমার ছোটো মামা, আমি এবং এক বন্ধু মিলে ঠিক করলাম সাইকেল চালানো শিখব। শুনেছি সাইকেল চালানো আর সাঁতার একবার শিখলে নাকি কেউ ভুলে না। কিন্তু আব্বু সাইকেল কিনে দিবে না। পুরান ঢাকায় থাকি। বুড়িগঙ্গা নদীর পাশে দেবিদাস ঘাট এলাকায় ছোটোদের জন্য সাইকেল পাওয়া যেত অর্থাৎ ভাড়া সাইকেল। খবর নিয়ে জেনেছি সেখানে এখনো সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়। আমাদের সময় তখন মাত্র ৪ টাকায় এক ঘণ্টার জন্য সাইকেল ভাড়া নিতাম। সাইকেল চালানো শিখতেই হবে তাই পড়ার অবসরে কিংবা বাসা থেকে লুকিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার সুযোগ পেলেই জমানো এক/দুই টাকা নিয়ে সাইকেল ভাড়া নিতাম। প্রথম প্রথম কতবার যে সাইকেল নিয়ে চিৎপটাং হয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। একজন বন্ধু সাইকেলকে পিছন থেকে ধরে রাখত, আরেকজন চালাতো। এভাবে চালানোটা শিখেও গেলাম। পরে অনেক দিনই আব্বুর চোখ ফাঁকি দিয়ে পুরনো ঢাকার অলিতেগলিতে ঘুরে বেরিয়েছি এই দ্বিচক্রযান নিয়ে।

পড়ালেখা শেষ করে চাকরি শুরু করে অনেকদিন পেরিয়ে যায় সাইকেল ধরা হয় কালে-ভদ্রে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে জাপান সরকারের বৃত্তি নিয়ে চলে যাই ইয়ামাগুচি শহরে। বৃত্তির নিয়মানুযায়ী কোনোরকমের মোটরযান আমরা চালাতে পারতাম না। ফলে সাইকেলই ছিল একমাত্র সহায়সম্বল যার মাধ্যমে ক্লাশে যাওয়া, বাজার করা, আশপাশে বেড়ানো ইত্যাদি করতে হতো। জাপানে সাইকেল চালানো ছিল এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। সেখানে প্রায় সব ঘরেই সাইকেল আছে। ছোটো ৪/৫ বছরের শিশু থেকে শুরু করে প্রায় ৮০/৯০ বছরের মানুষও সাইকেল চালায়। পাহাড়ের উঁচুনীচু পথেও তারা স্বাচ্ছন্দ্যে সাইকেল চালাতে পারে। অবশ্য এটা ঠিক যে জাপানে সাইকেল চালাতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আছে। যেমন, সাইকেল চালানোর জন্য একটা নির্দিষ্ট লেন থাকে। আরো কিছু মজার তথ্য আছে জাপানের সাইকেল সংক্রান্ত। তারমধ্যে অন্যতম হলো, সাইকেল কেনার পর তা নিজ নামে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় নতুবা পুলিশি ঝামেলা হতে পারে। জাপানে প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শপিং মলে গাড়ি পার্ক করার পাশাপাশি সাইকেল পার্ক করারও ব্যবস্থা থাকে। জাপানিজরা খুবই কর্মঠ, তারা খুব দ্রুত সাইকেল চালাতে পারে। এমনকি দেখা যায়

সাইকেল

জেরিন আক্তার

আমাদের গাঁয়ের কন্যারা
স্কুলে যায় সাইকেল চালিয়ে
সামনে এগিয়ে যাচ্ছে তারা
সব বাধা পেরিয়ে।

সিটে বেঁধে বই-খাতা
সামনে স্বপ্নময় দৃষ্টি
ছুটে চলে তারা
বাধা ডিঙিয়ে ঝড়বৃষ্টি।

একাদশ শ্রেণি, মতিঝিল মডেল হাই স্কুল, ঢাকা।

বৃষ্টির মধ্যে এক হাতে ছাতা নিয়ে সুন্দরভাবে সাইকেল চালাচ্ছে—যদিও এটা আইনসম্মত নয় এবং বিপদজনক। সন্ধ্যার পরে সাইকেল চালাতে হলে অবশ্যই সাইকেলে সংযুক্ত বাতিটি বা টর্চ লাইটটি জ্বালাতেই হবে, অন্যথায় পুলিশ ধরলে জরিমানা হবে। তাই পুলিশ বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষের সাথে সাইকেল চালানোর নিয়ম-কানুন নিয়ে আলোচনা করে এবং শেখায়। অনেক সময় তারা গিয়ার সংবলিত এবং ব্যাটারিচালিত সাইকেল চালায়, ফলে সাইকেল ভ্রমণ আরো সহজ হয়। আরেকটা ব্যাপার হলো, সাইকেলে বাচ্চাদের নিয়ে চালানোর জন্য হ্যান্ডেল বা সিটের সাথে বিশেষভাবে তৈরি 'বেবি সিটার' সংযুক্ত করা যায়। বেবি সিটারগুলোতে সিটবেল্টও থাকে , এমনকি পা রাখার জন্য নিরাপদ স্ট্যান্ড থাকে। তাই দেখা যায় যে, একজন মা সামনে ও পিছনে দুইজন বাচ্চাকে নিয়ে অনায়াসে রাস্তায় চলাচল করছে। জাপানে সাইকেল তাই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এজন্য টোকিওসহ অনেক শহরে উহল পুলিশদের সাইকেল ব্যবহার করতে দেখা যায়।

২০১৩ থেকে ২০১৫ দুই বছর আমি সাইকেল খুবই উপভোগ করেছি। একসাথে ভ্রমণ ও ব্যায়াম দুটোই হয়েছিল আমার। কিন্তু ঢাকায় ফিরে সাইকেলকে খুবই মিস করেছি। তবে ইদানিং ঢাকায় অনেক স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থী কিংবা মধ্যবয়স্ক লোককে দেখা যায়, এমনকি মেয়েরাও সাইকেল চালাচ্ছে— এটা খুব আশা জাগানিয়া বিষয়। সত্যি কথা বলতে কী ঢাকার মতো ব্যস্ত নগরীতে যানবাহনের বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে সাইকেল হতে পারে অন্যতম উপায়। আসলে সাইকেলকে বলা যায় 'স্বাধীন বাহন'। যা আমাদের স্বাধীনভাবে যে-কোনো পথে (অবশ্যই ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে) চলতে সাহায্য করতে পারে। যা সময় বাঁচায় এবং সুলভ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সাইকেল শুধু পরিবেশ দূষণ করে না বরং সুস্বাস্থ্য গড়তেও সাহায্য করে।

তাই এসো, আমরা সাইকেলে চলাচল করার অভ্যাস করি। দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করি। সরকার সাইকেল চালানোকে উৎসাহিত করতে বিশেষ করে মেয়েদের জন্য বিভিন্ন উপজেলায় ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণ করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমাদের নগর-পিতাদের কাছে আবেদন করি যেন আমাদের রাস্তাগুলোকে সাইকেল বান্ধব করে তুলেন। সুস্থ জাতি ও সুন্দর পরিবেশ গড়তে শুরু হোক স্বাধীন বাহন- 'সাইকেল অভিযান'।

বুবলীর বাইসাইকেল কিস্‌সা

ড. শিল্পী ভদ্র

বুবলী ওর ভাই বিপান থেকে দশ বছরের ছোটো। ছেলেবেলা থেকে বুবলী বিপানকে সাইকেল চালাতে দেখে বড়ো হয়েছে। যখন আধো আধো কথা বলতে পারত হাত বাড়িয়ে সাইকেল দেখিয়ে 'সাঁ' 'সাঁ' বলত। এর বেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ, প্যাডেল ঘোরা- সবই ছিল ছোটো বুবলীর কাছে বিস্ময় আর আনন্দের। সাইকেলে ওঠার জন্য বিপানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিত। ওকে সাইকেলের সিটে বসিয়ে দিলে আঙুল দিয়ে বেল দেখাতো, বেল বাজালেই খিলখিল করে হেসে উঠত। তাকে ধরে ধরেই বিপান পায়ে হেঁটে কিছু সময় সাইকেলে না ঘুরিয়ে কোনো উপায় থাকত না।

এর মাঝেই দিন-মাস-বছর কেটে গিয়েছে অনেকটা। বুবলী এখন ১০-এ পা দিয়েছে। তার বয়স বাড়ার মতো সাইকেল চালাতে শেখার শখটাও বেড়েছে। বিপান এখন বিবিএ পড়ছে। বোনকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ১০ বছর হলে সাইকেল চালানো শেখাবে। গ্রামের মুরুব্বিরা অবশ্য চায় না বুবলী সাইকেল চালাক। শত হলেও মেয়ে। পাঁচজন ৫ কথা বলবে। তাছাড়া মেয়েদের অত দস্যিপনার দরকার নেই। এটাই তাদের মত।

বিপান বোনকে দেওয়া কথা রাখতে একদিন বুবলীর অনেক অনুরোধে রাজি হলো সাইকেল চালানো শেখাতে।

সে বলল: বোন, খুব ভোরে আমি যে প্রাইভেট পড়তে যাই সেই স্যার অসুস্থ বলে এক সপ্তাহ পড়াবেন না। এই সাতদিন তোকে আমি সাইকেল চালাতে শেখাব। কিন্তু বাড়ি থেকে তোকে নিয়ে বের হব কী বলে সেটাই ভাবছি।

: হ্যাঁ বোন পেয়েছি।

: কী দাদা?

: স্যারের মেয়েটা তোর ক্লাসেই পড়ে। ওর সাথে পড়ালেখার কথা বলে যাবি- বললে কেউ মানা করবে না।

: ঠিক বলেছিস দাদা।

: তা হলে আগামীকাল সকাল থেকেই সাইকেল চালানোর ট্রেনিং শুরু হবে, ঠিক আছে?

: খুব খুশি লাগছে রে। এতদিনের আশা আমার পূর্ণ হবে দাদা!

: পাকামো কথা না বলে আগামীকালের জন্য রেডি হও।

: রেডি মানে?

: মানে জুতা, মোজা, গ্লাভস, কনুই হাতের গাউন লাগবে।

: জুতা, মোজা ছাড়া বাকিগুলো কোথায় পাবো দাদা?

: প্রতিদিন তোর অনুরোধের তোড়ে

বাকিগুলো আগেই আমি সদরের বড়ো দোকান থেকে কিনে রেখেছি। আসলে হেলমেটটা বেশি দরকার সাইকেল শেখায়।

: কেন?

: কারণ চুপ্‌পুত করে পরে যেতে পারো। ভেবেছিলাম, সামনের মাসে তিন মাসের জন্য আইটি ট্রেনিং-এ ঢাকা যাব, তখন কিনে আনব। কিন্তু তুই যা বায়না শুরু করলি তাতে এখনই শুরু করতে হলো। অবশ্য এখন স্যারের পড়া নেই, সে সময়টা কাজে লাগবে তোর সাইকেল চালাতে শেখার।

দাদার সাথে কথা বলার পর সেদিন বিকালেই বুবলী ওর স্কুল ব্যাগে ট্রেনিং-এর সব জিনিস ঢুকায়। রাতে বিপান মাকে বলল, বুবলীকে স্যারের বাসায় নিয়ে যাবার বিষয়ে। মা অমত করলেন না।

পরদিন ভোর সাতটায় বিপান বুবলীকে ছোটো ঘাসের বড়ো একটা মাঠে নিয়ে গেল। এই মাঠের এক প্রান্ত আবার ঢালু। বুবলী সাইকেল চালাতে গিয়ে পড়ে গেলে ঘাস থাকায় ব্যথা কম পাবে। আবার ঢালু দিয়ে সাইকেল আস্তে আস্তে চালাবে তখন পড়ে যেতে চাইলে নিচে পা নামিয়ে দিলে পড়ে যাবে না।

সকালের নির্মল হাওয়ায় বিস্তৃত সবুজ ঘাসের মাঠে এসে বুবলীর খুব আনন্দ হলো। চারিদিকে সে তাকিয়ে ভাবছিল, আজ তার আশা পূরণের ১ম দিন। তার ভাবনার ঘোর কাটল বিপানের ডাকে।

: বুবলী জুতা-মোজা তো পড়েই এসেছিস; সালোয়ারের নিচের অংশ মোজার ভেতর গুঁজে দিতে হবে আর জুতার ফিতা জুতার ভেতর গুঁজে দিব; এদিকে আয় তো বোন। আর আমি যা যা বলব মন দিয়ে খুব মন দিয়ে শুনবি।

: ঠিক আছে দাদা।

: শোন, সাইকেল চালাতে তিনটা বিষয় মনে রাখবি। প্রথম হচ্ছে চাকার ব্যবহার শেখা এবং চাকার সাহায্যে কীভাবে সাইকেল চালানো হয় তা।

দ্বিতীয় হচ্ছে প্যাডেল ঘোরানো। প্রথমে এক প্যাডেল চালাবে এরপরে তোকে দু প্যাডেল একসাথে চালাতে শেখাবো।

সবশেষে তৃতীয় নম্বর হচ্ছে সিটে বসে, হাতল ধরে প্যাডেল চালিয়ে তুই যখন ভারসাম্য রাখতে পারবি তখনই সাইকেল চলবে। মনে রাখবি বোন, সাইকেল চালানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ব্যালেন্স বা ভারসাম্য রাখা।

প্রতিটা বিষয় বুবলী খুব ভালোভাবে দাদার কাছে বুঝে নিয়ে দুই দিনেই শিখে গেল। তৃতীয় দিনে বিপান ওকে সাইকেল চালাতে দিল আস্তে আস্তে। সে ওর পাশে পাশে থাকল কিন্তু সাইকেল ধরল না। বুবলী বেশ ভালোই সাইকেল চালালো।

: খুব ভালো পেরেছিস বোন। এবার তুই ঢাল দিয়ে সাইকেল চালিয়ে মাঠে আসবি। ধীরে ধীরে চালাবে, পড়ে যেতে চাইলে পা নামিয়ে দিবি।

বুবলী সেটাও খুব ভালো করল। পাঁচ দিনের দিন সে ভারসাম্য রেখে আস্তে আস্তে সাইকেল চালাতে পারল। বিপান অবশ্য ওর পাশে পাশেই ছিল। ৬ষ্ঠ এবং সপ্তম দিনে বুবলী গোল করে ঘুরে ঘুরে ঢালের উপর যেতে, ঢাল থেকে নিচে নামতে সবই শিখে গেল। বুবলী আনন্দে বিপানের হাত, দুহাতে চেপে ধরে বলল-

: দাদা আমি পেরে গেছি, সত্যি পেরে গেছি। আজ আমার অনেক আনন্দ হচ্ছে। অনেক ভালো লাগছে।

বিপানও হাসল, ওর বোন বুবলী এত অল্প সময়ে সাইকেল চালাতে পেরেছে দেখে।

এরপর বিপান তিন মাসের আইটি ট্রেনিং নিতে ঢাকায় চলে গেল। ওর সাইকেলটা বারান্দার এক কোণে রেখে গেল। বুবলী সাইকেলটা পড়ে থাকতে দেখে ভাবল সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাবে এবং বাড়ির সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে সে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে গেল। স্কুলের দপ্তরি চাচা, টিচার, সহপাঠী যারাই তাকে সাইকেল চালাতে দেখল– সবাই অবাক। এই স্কুলে সেই প্রথম মেয়ে, যে কি না সাইকেল চালিয়ে স্কুলে এসেছে। বুবলীকে সবাই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলে তার উত্তরে সে বলল তার দাদা তাকে শিখিয়েছে। এরপর থেকে সে স্কুলে সাইকেলে চড়েই যেতে আসতে লাগল। ওর বাসায় একটু আপত্তি উঠলে তার শিক্ষক পিতা শিখর বললেন–

: সাইকেল চালানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে, অল্প বা বিনা খরচে সাইকেলে চড়ে পথচলা যায়। মালামাল পরিবহণের জন্য সাইকেল বেশ উপকার করে। সাইকেল চালাতে বাড়তি জায়গা লাগে না। ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে সাইকেলের তুলনা নেই। এটা চালালে শারীরিক ব্যায়াম হয়ে যায়। মোটর যানের মতো এর ধোঁয়া নেই, তাই পরিবেশ বান্ধব সাইকেলের খুবই দরকার পৃথিবীকে সবুজ রাখতে।

গ্রামের অনেকের প্রশ্নের জবাবও তিনি এভাবেই দিলেন। বিষয়টা গ্রামে বেশ আলোড়ন তুলল। সবাই

ভেবে দেখল কথাগুলো সত্য এবং যুগোপযোগী। তখন গ্রামের অনেকেই তাদের মেয়েদের সাইকেল কিনে দিল। অনেকের ভাই তাদের বোনদের সাইকেল চালানো শেখালো।

মাস তিনেক পর বিপান গ্রামে ফিরে দেখল সাইকেল সেখানে অনেক জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম হয়েছে। শুধু স্কুলে নয়, অনেকেই সাইকেলে চড়ে হাটবাজার কোর্ট-কাচারি করতে শুরু করেছে। তারা সুস্বাস্থ্য, পরিবেশ বান্ধব, ব্যবসা সঙ্গী, খরচ কম, সময় বাঁচার বিষয়গুলো বেশ ভালোভাবেই গ্রহণ করেছেন।

'সাইকেল' বুবলীদের গ্রামে গতিময়তা এনে দিল। গ্রামের সবাই তখন সিদ্ধান্ত নিল- বিপান আর বুবলীকে 'সাইকেল উদ্যোক্তা' হিসেবে পুরস্কার দেবে। পুরস্কার হিসেবে বুবলীকে নতুন একটা সাইকেল কিনে দিল। সবাই মিলে আর বিপানকে দিল 'শ্রেষ্ঠ সাইকেল উদ্যোক্তা' হিসেবে সার্টিফিকেট, বুবলীর সাইকেল নেই দেখে সবার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া।

অনুষ্ঠানে বিপানকে তার অনুভূতি বলতে বলা হলে সে বলল—

: আমাকে পুরস্কৃত করা এবং কিছু বলতে বলার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমি ঢাকায় আইটি ট্রেনিং-এ গিয়ে দেখে এসেছি, সেখানে সাইকেলের ব্যবহার অনেক বেড়ে গিয়েছে। পরিবেশ দূষণ থেকে শহরটাকে বাঁচাতে পরিবেশ সচেতন উদ্যোমী যুবকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সকলে সাইকেল চালাবার। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের তৃতীয় সাইকেল রপ্তানীকারক দেশ। বিজয় শর্মা পরিবেশ বান্ধব বাঁশের সাইকেল তৈরি করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের বাজারের একটি বিশাল অংশে সাইকেল রপ্তানি হয়ে থাকে। বর্তমানে 'প্রাণ আরএফএল' হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সাইকেল উৎপাদনের কারখানা। এতে ৮০০ প্রশিক্ষিত স্থানীয় কর্মী কাজ করছে। এর নাম 'দুরন্ত'।

আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি সবাই মিলে ভালো কাজে এগিয়ে আসি; ভালো-ভালো কাজ করি তাহলে বাংলাদেশের উন্নতি হবেই। তাতে সব দিক থেকে সবাই মিলে ভালো থাকব। আমরা সবাই তাই ভাবব- কীভাবে দেশের আরো ভালো করা যায়। দেশকে আরো এগিয়ে নেওয়া যায়। কী ঠিক বলিনি আমি?

সবাই উত্তর দিল— ঠিক, একদম ঠিক; সে সাথে চারিদিক থেকে অনেকক্ষণ ধরে করতালি পড়তেই থাকল।

বাইসাইকেল

ওয়াসিফ-এ- খোদা

কার বাস রেল
গোলযোগে ফেল
নাই গ্যাস তেল
তাও নয় পেল
ক্রিং ক্রিং বেল
দুই পায়ে প্যাডেল
বাইসাইকেল।
বাইসাইকেল
ইচ্ছা অঢেল
আরোহীর খেল
মেল কী ফিমেল
যেন যান তেল
কামানের শেল
না-ফেইরি টেল...

সাইকেলঅলা

সনজিত দে

সাইকেলে যাবে খোকা
ওই দূর দেশে
তাই শুনে দাদু ওঠে
ফিক করে হেসে।
সাইকেলে উঠে খোকা
শুধু পড়ে যায়
দাঁড়িয়ে মা মিটিমিটি
হাসে দরজায় ।
খোকা ফের প্যাডেলে
জোরে দেয় চাপ
সাইকেল শেখা তাঁর
হলো বুঝি হাফ ।
প্রতিদিন সাইকেলে
করে হাঁটাচলা
বাবা বলে খোকা আজ
সাইকেলঅলা ।

সাইকেল স্মৃতি

লাল সাইকেল

রকিবুল ইসলাম

একটি লাল সাইকেলের শখ অনেক দিনের। লাল মানে লাল। একদম টকটকে লাল। ঠিক নয়নের সাইকেলটার মতো।

আমি তখন ছোটো। ওয়ান কী টুতে পড়ি। নয়ন আমার সমবয়েসি। ওর বাবা বড়ো আর্মি অফিসার। বাবার রিটায়ার্ডের পর গ্রামে বসবাস। নয়ন সারাদিন সাইকেল চালাতো। মহিদ, সোহাগ আর আমি সাইকেলের পেছনে দৌড়াতাম। কখনো ঠেলতাম, কখনো এমনিই দৌড়াতাম। মাঝে মাঝে নয়ন আমাদের সাইকেল চালাতে দিত। কিন্তু আমরা কেউই সাইকেল চালাতে পারতাম না। সাইকেলের হাতল ধরে ঠেলতাম। খুব ইচ্ছে হতো, নয়নের মতো সাঁই সাঁই করে সাইকেল চালাই। কিন্তু যতবার উঠতে যেতাম, ধপ করে পড়ে যেতাম।

এজন্য নয়নও আমাদের তেমন আর চালাতে দিত না। অতএব দৌড়াও সাইকেলের পেছনে পেছনে!

বাবাকে বলার সাহস হতো না। ভয়ে ভয়ে মাকে একবার-দুইবার বলেছি। মা আমার সাইকেলের ইচ্ছা শুনে আড়ালে চোখ মুছতেন। বাবার সামর্থ্য না থাকায় মা কখনো বাবাকে বলতেও পারেননি। কিন্তু আমাকে বলতেন, আর একটু বড়ো হ বাবা। তারপর তোকেও নয়নের মতো লাল সাইকেল কিনে দেবো।

আমি বলতাম, ঠিক যেন নয়নের সাইকেলটার মতো লাল হয়। নয়ন যখন সাইকেল চালায়, তখন কী যে ভালো লাগে ওকে! মনে হয়, রাজপুত্র পঙ্খিরাজের পিঠে চড়ে ঘুরছে।

প্রতিদিন ইশকুল থেকে ফিরে এসে বের হতাম নয়নের সাথে। যদি একটু চালাতে দিত, তবে ধন্য হতো জীবন। মাঝে মাঝে নাওয়া-খাওয়ার কথাও ভুলে যেতাম।

নয়নের বাবা শহরে বাড়ি কিনল। নয়ন ওর বাবা-মার সাথে শহরে চলে গেল। সাথে নিয়ে গেল লাল সাইকেলটা। যেদিন ওরা চলে যাচ্ছিল, সেদিন আমি ইশকুলে ছিলাম। বাড়ি ফিরে জানলাম নয়নরা চলে গেছে। আর সাথে চলে গেছে সাধের লাল সাইকেলটাও। মনের অজান্তে চোখ বেয়ে পানি ঝরেছিল। কাউকে বুঝতে দেইনি। আমার মন খারাপ দেখে মা বললেন- বড়ো হ বাবা, তোকেও সাইকেল কিনে দেওয়া হবে। আমি মাকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলাম।

ক্লাস এইটে পড়ার সময় বাবা আমাকে সাইকেল কিনে দিলেন। আমার খুব আনন্দ লাগল। আনন্দে সেদিন আর ইশকুলে যাওয়া হয়নি। সারা গ্রাম সাইকেল নিয়ে ঘুরেছিলাম। তারপরও নয়নের লাল সাইকেলটার কথা ভুলতে পারিনি। এখনো ছোটোবেলার সেই ছোটো লাল সাইকেল আমার মনের মাঝে বনবন করে চাকা ঘুরায়।

দুরন্ত সাইকেলে

লোকমান আহম্মদ আপন

সাইকেলে সাঁই সাঁই
তুলে ঝড়োগতি
না দিয়েই পথে কোনো
দাড়ি-কমা-যতি
বহুদূরে চলে যাই
কাউকে না বলে যাই
কৈশোরের এই আমি
দুরন্ত অতি।

একটু না ছেড়ে হাঁপ
পেডেলেতে দিয়ে চাপ
বহুদূরে চলে যাই
কাঁচা পথ দলে যাই
থামবার নাম নেই
কষ্টের ঘাম নেই
দুরন্ত সময়ের
সাইকেল সাথি
কৈশোরে সাইকেলে
দুরন্তে মাতি।

সাইকেলের নিচে পড়েছিলেন আফজাল স্যার

মিজানুর রহমান মিখুন

আমি তখন সিক্স কী সেভেনে পড়ি। তখনো সাইকেল চালানো শিখিনি। আমার বড়ো ভাইয়ের সাইকেল ছিল। সে যখন যেখানে খুশি যেতে পারেন। মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখি সে কী দুরন্ত গতিতে সাইকেল চালায়। এইসব দেখে আমার সাইকেল চালানোর ভীষণ ইচ্ছে হলো।

আমিও সাইকেল চালানো শিখব। এ কথা বাবার কানে পৌঁছাতেই তিনি রেগেমেগে একাকার। এত অল্প বয়সে সাইকেল চালানো শেখা যাবে না। কারণ হিসেবে বাবা জানালেন সাইকেল চালানো শিখলে সারাদিন এটা নিয়ে ঘোরাঘুরি করব, লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটবে। সেইসঙ্গে রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনায় হাত-পা ভেঙে যাবে।

অবশ্য সাইকেল চালাতে বাবার বাধা দেওয়ার বিষয়টা তখন অযৌক্তিক ছিল না। আমার বড়ো ভাই সাইকেল নিয়ে বেশি ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে লেখাপড়া তখন লাটে উঠেছে। তা ছাড়া আমাদের বাড়ির আশপাশের অনেকেই সাইকেল চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমি এসবের কিছুই করব না। কিন্তু কিছুতেই তাকে রাজি করাতে পারলাম না। বাবা স্রেফ জানিয়ে দিয়েছেন আমি কিছুতেই সাইকেল চালাতে পারব না।

আমি তো দমে যাওয়ার পাত্র নই। সিদ্ধান্ত নিলাম আমি আর সাইফুল দুজনে মিলে লুকিয়ে লুকিয়ে সাইকেল চালানো শিখব। সাইফুল আমার মামাতো ভাই। আমরা একই বয়সি। আমাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বও রয়েছে।

আমার বড়ো ভাইয়ের কাছে গেলাম। তাকে জানালাম, ভাইয়া আমরা সাইকেল চালানো শিখব। আপনার সাইকেলখানা দিতে হবে। ভাইয়া তো একবাক্যে না করে দিলেন। তিনি জানালেন নতুন সাইকেল দিয়ে সাইকেল চালানো শেখা যাবে না। তাতে সাইকেলে আঘাত লাগবে। সাইকেল নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি আরো জানালেন, গ্যারেজ থেকে সাইকেল ভাড়ায় নিয়ে চালানো শিখতে হবে। দরকার হলে সাইকেল ভাড়ার টাকা ভাইয়া দিবেন। এরপর আমরা ভাড়ায় সাইকেল এনে গোপনে গোপনে সাইকেল চালানো শিখলাম।

একদিন ভাইয়ার কাছে তার সাইকেলখানা চাইলাম। বললাম, আমি সাইকেল চালিয়ে মিরের হাটে খেলা দেখতে যাব। সেখানে বড়ো ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছে। আমাকে আপনার সাইকেলখানা দেন। ভাইয়া আবারো বিজ্ঞের মতো জানালেন, ভালো ভাবে সাইকেল চালানো রপ্ত না করে বড়ো রাস্তায় এবং এত দূরের পথে সাইকেল নিয়ে যাওয়া যাবে না। দুর্ঘটনায় পড়বে। আমি বললাম, ভালো ভাবেই সাইকেল চালানো শিখেছি। দুইজন নিয়েও চালাতে পারি। এরপরও ভাইয়া রাজি হলেন না। তিনি বললেন, এ অল্প কয়েকদিনে তুমি পাকা হওনি। যাও, অন্য কাজে মন দাও।

কিন্তু আমি ভাইয়াকে না জানিয়ে তার সাইকেল নিয়ে মিরের হাটে রওনা দিলাম।

দুরন্ত গতিতে সাইকেল চালাচ্ছি। আমাকে আর রাখে কে! নিজেকে নায়ক নায়ক মনে হচ্ছে। কিছু দূর যেতেই দেখি সামনে একজন পথচারী। আমি সাইকেলে বেল বাজাচ্ছি। আমার বেল বাজানোতে ঐ পথচারী যেটুকু পথ সরে গিয়ে হাঁটছেন তাতে আমার হচ্ছে না। এদিকে ব্রেক কষে সাইকেল থামাতে পারছি না। এ পর্যায়ে আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার গায়ের উপর সাইকেল চালিয়ে দিলাম। সাইকেলের গতি বেশি থাকায় ঐ পথচারীকে নিয়ে আমি রাস্তা থেকে খালের পাড়ে পড়ে গেলাম। ঐ পথচারী তো চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি তিনি ভীষণ ব্যথা পেয়েছেন। কাতর কণ্ঠে বলছেন, এই বেয়াদব ছেলে, ভালো করে সাইকেল চালানো না শিখে রাস্তায় এসেছো কেন? উহ্ আমার কোমর বুঝি ভেঙে গেছে...। আজ তোমাকে উচিত শিক্ষা দেব।

আমি তো ভয়ে মরে যাচ্ছি। সাইকেল নিয়ে পড়ে যাওয়ার জন্য নয়। ভয় পেয়েছি অন্য কারণে। যে স্থানে সাইকেল নিয়ে পড়েছি, সেটি আমার বাবার মাদ্রাসার সামনে। মাদ্রাসার নাম পশ্চিম পুটিয়াখালী দারুল ইসলাম সিনিয়র মাদ্রাসা। মাদ্রাসায় তখন ক্লাস চলছে। এখানে বাবা শিক্ষকতা করেন। তিনিও ক্লাস নিচ্ছেন। বাবা জানতে পারলে আজ আমার খবর আছে।

এদিকে আমি তো সাইকেল নিয়ে খালের পাড়ের কাদার মধ্যে আটকে গেছি। যিনি আমার সাইকেলের নিচে পড়েছেন কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে টেনে তুলেছেন। তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, আহারে বাবা! কোথাও ব্যথা পাওনি তো? তিনি আমাকে চিনতে পেরেছেন। তিনি আরো বলছেন, আমি প্রথমে তোমাকে চিনতে পারিনি তাই বকাঝকা করেছি। মনে কিছু করো না।

আমি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললাম, না স্যার। ব্যথা পাইনি। তবে আব্বার কাছে বলবেন না যে আমি এখানে সাইকেল নিয়ে পড়েছি। তাহলে আজকে তিনি আমাকে বাড়ি ছাড়া করবেন।

যিনি আমার সাইকেলের নিচে পড়েছেন তিনি আফজাল মাস্টার। আমার বাবার সহকর্মী। আমরা তাকে 'আফজাল স্যার' বলে ডাকি।

এরপর আফজাল স্যার আমাকে রাস্তায় তুলে দিয়ে বললেন, সোজা বাড়ি যাও। কোথাও কোনো ব্যথা পেয়ে থাকলে ডাক্তার দেখিয়ে ঔষধ কিনে নিও।

আমার সাইকেল চালানো ও ভবিষ্যৎ চাওয়া

নিতু চৌধুরী

আমার দাদার কাছ থেকে শিখি প্রথম সাইকেল চালানো। অবাক লাগত দু চাকায় সাইকেল চলছে বলে। এক সময় দাদাই আমাকে সাহস দেয়-তুমিও পারবে সাইকেল চালাতে । সাইকেল যেহেতু চালাতে পেরেছি আমার সামনের চকচকে পথের মতো দূরেও যেতে পারব। সাইকেল চালিয়েই মানুষের সেবার মতো কাজও করতে চাই আমি। আমার বাবা বলেন পরিবেশ বাঁচাতেও সাইকেলের গুরুত্ব অনেক। মেয়েদের চলাচলের জন্য সাইকেল হতে পারে আরেকটি নিরাপদ বাহনের নাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ প্রতিটি স্কুলের আগে যেন রাস্তা ভালো করে দেওয়া হয় এবং বৃত্তি হিসেবে দূরের ছাত্রীদের যেন সাইকেল উপহার দেওয়া হয় স্কুলে আসা-যাওয়ার জন্য।

৫ম শ্রেণি, চকপাড়া আইডিয়াল পাবলিক স্কুল, শ্রীপুর, গাজীপুর

সাইকেল চোর

শামীম খান যুবরাজ

আমি তখন কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। আমার ক্লাসমেটদের মধ্যে যে ক'জন ঘনিষ্ঠ ছিল তাদেরই একজন তুহিন। ক্লাসের ফাঁকে একদিন তুহিন আমাকে বলল, 'আমার সাইকেলটা বিক্রি করে দেবো দোস্ত, একজন কাস্টোমার দেখ।'

তার কথায় আমার ছোটো ভাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তার জন্য একটা সাইকেল কেনার তাগিদ দিচ্ছিলো বাড়ি থেকে। ভাবলাম তুহিনের সাইকেলটা কিনে নিলে মন্দ হয় না। ভালো দামেও নেওয়া যাবে। অবশেষে তুহিনের সাথে লেনদেন করে সাইকেলটা নিয়েই নিলাম ছোটো ভাই হারুনের জন্য।

সাইকেল কেনার পর থেকে তুহিন তাগাদা দিতে লাগল সিট পরিবর্তন ও সাইকেলে নতুন রং দেওয়ার জন্য। দেখলাম সিট তো ঠিকই আছে আর রংও তেমন নষ্ট হয়নি, তাই আর ওর কথার তোয়াক্কা করলাম না।

তার কথায় কান দিচ্ছি না দেখে সে আমাকে একদিন ডেকে বলল, 'আকরাম, সাইকেলটা রং করে নে না। দেখবি কত সুন্দর দেখাবে। টাকা আর কতই লাগবে। টাকা না হয় আমিই দেব। তুই রংটা করে সাইকেলটার চেহারাটা পালটে দে।'

আমি ওর কথায় আশ্চর্য হলেও টাকা নিতে রাজি হইনি। শুধু বললাম, আরেকটু পুরানো হয়ে নিক। রঙের বালতিতে ডুবিয়ে নেবো তখন।

বাড়ি গিয়ে বিষয়টা নিয়ে অনেক ভাবলাম, হাড়কিপটে তুহিন কেন আমাকে টাকা দিতে চায়? কিছুই মাথায় আসলো না। মেনে নিলাম যেহেতু ক্লাস ফ্রেন্ড,

বলতেই পারে। এ নিয়ে আর ভাবিনি কখনো।

আমার প্রতিদিন পায়ে হেঁটে কলেজে যাওয়ার অভ্যেস। ছোটো ভাই হারুন প্রতিদিন তুহিন থেকে নেওয়া সাইকেলটায় চড়ে কলেজে যায়। একদিন এক জরুরি কাজে হারুনের কাছ থেকে সাইকেলটা নিয়ে কালীগঞ্জ হয়ে পলাশ গেলাম। তারপর জামালপুর হয়ে ফেরার পথে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে ঢুকে পড়লাম তাড়াতাড়ি ফিরব বলে। জামালপুর থেকে বেশ কিছু দূর গেলে যে গ্রামটা পড়ে তার নাম নাসেরা। নাসেরার সবুজ-শ্যামল প্রকৃতির মধ্যদিয়ে আমার সাইকেল ছুটে চলছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় গ্রাম্য রাস্তা প্রায় ফাঁকা। মাঝে মাঝে গরু-বাছুর নিয়ে কৃষকদের বাড়ি ফেরার দৃশ্যগুলো চোখে পড়ছিল। মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে আমার সাইকেল ছুটছে নিজ গ্রামের দিকে। হঠাৎ পথ আগলে দাঁড়ালো এক তরুণ। তরুণের চোখে-মুখে যুদ্ধজয়ের উল্লাস 'পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়ে গেছি।' তার চিৎকারে আশেপাশের কয়েক বাড়ি থেকে ছুটে এল পাঁচ-ছয় জন লোক। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার হাত থেকে সাইকেলটি কেড়ে নিয়ে হাঁটতে লাগল ডান পাশের সরু রাস্তা ধরে। আমিও হতভম্বের মতো ওদের পেছনে হাঁটতে লাগলাম। সরু রাস্তাটি একটি বাড়ির রাস্তা। সাইকেলটি নিয়ে সবাই ঢুকল সেই বাড়িতে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, 'চেহারা তো ভালোই আর করে কিনা চুরির ধান্দা।' লোকটার কথা শুনে 'চিচিং ফাঁক' বলে আমার মগজের দরজাটা খুলে গেল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ওরা আমাকে চোর ভেবেছে, কিন্তু সাইকেলটা তো আমার! আবার 'চিচিং বন্ধ' বলা ছাড়াই মগজের দরজা বন্ধ হওয়ার বিকট শব্দ পেলাম। মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিল, বিষয়টা কী? কোনো ভাবেই আঁচ করতে পারছি না।

সাইকেল কেনার পর থেকে তুহিন তাগাদা দিতে লাগল সিট পরিবর্তন ও সাইকেলে নতুন রং দেওয়ার জন্য। দেখলাম সিট তো ঠিকই আছে আর রংও তেমন নষ্ট হয়নি, তাই আর ওর কথার তোয়াক্কা করলাম না।

এরই মধ্যে চারিদিক থেকে জড়ো হয় নারী-পুরুষের অর্ধশত মিছিল। একেক জনের মুখে একেক রকম মন্তব্য। আমাকে কথা বলার সুযোগই দিচ্ছে না কেউ। 'ব্যাটা চোর, ডলা দিলেই আসল ঘটনা বেরিয়ে আসবে। তুহিনকে ডেকে নিয়ে আয়' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহা ঝামেলায় পড়ে গিয়েও এক প্রকার নিজের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করলাম। চিৎকার দিয়ে বললাম–'আমি চোর টোর কেউ নই। আপনারা ভুল করছেন। এই সাইকেলটা আমার। আমি রাওনাটের পঞ্চায়েতের নাতি।' আমার কথায় সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল। ভিড়ের মধ্যে একটা মুখ হঠাৎ চেনা মনে হলো আমার কাছে। চেনা মুখের সেই মানুষটা আমার দিকেই এগিয়ে এল–'আরে আকরাম, তুমি এখানে?'

চেনা মুখটা এবার স্পষ্ট হলো আমার কাছে। সে সীমা, আমার ক্লাসমেট। তুহিনের বোন। তুহিন ও সীমা আমার সাথেই পড়ে। আমি বললাম–সীমা তুমি এখানে কী করছ?

ততক্ষণে আমার খাতিরদারি শুরু হয়ে গেছে। কেউ হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে। কেউ হাতে শরবত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন ঘর থেকে চেয়ার বের করে বসার জন্য অনুরোধ করলে আমি বসে যাই।

সীমা বলল, এটা আমাদের বাড়ি। আর তুমি এই সাইকেলটা কোথায় খুঁজে পেলে? ভাইয়ার এই সাইকেলটা কিছুদিন আগে চুরি হয়ে যায়।

সীমাকে বললাম, এটা তো তুহিন আমার কাছে বেচে দিয়েছে, চুরি হবে কীভাবে?

এবার 'চিচিং ফাঁক' বলা ছাড়াই আমার মগজের গুদাম ঘরটা খুলে গেল। সাইকেল মালিক নিজেই তাহলে চোর? ব্যাটা তুহিন, এজন্যই সাইকেলে রং করার জন্য প্রতিদিন তোর এত তাগিদ!

উপসংহারঃ স্বসম্মানে আমাকে সাইকেল হাতে বিদায় দিল তুহিনের বাড়ির লোকজন। এদিকে তুহিন ঘটনা আঁচ করতে পেরে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে। বেশ ক'দিন পর কলেজে দেখা ওর সাথে, বললাম-তুহিন টাকা দে না সাইকেলটা রং করে নিই। বেচারা মাথা নিচু করে হনহন করে চলে গেল আর কোনোদিন আমার সামনে পড়েনি।

সাইকেলের আফসোস

অভ্র ফারিহা

আমরা দুই বোন, আমি ছোটো আর আপু বড়ো। আপুর নাম মালিহা আহসান (রৌদ্র মালিহা) আমার নাম ফারিহা আহসান (অভ্র ফারিহা)। আমরা দুই বোন অভ্র আর রৌদ্র নামেই পত্রিকায় লিখি। একটা দারুণ খবর আছে, তা হলো আমরা দুই বোন আর আমার আম্মু তিনজন মিলে একটা বই বের করেছি ২০১৬ সালে। বইটি অমর একুশে বইমেলায় 'মুক্তদেশ প্রকাশন' থেকে বের হয়েছে। বইটির নাম 'মেঘনার মিষ্টি স্বপ্ন'। বইটিতে আম্মুর ৪টি, আপুর ৯টি ও আমার ৬টি গল্প আছে। অনেকে বলেছে আমাদের দেশে নাকি এর আগে এমন মা-মেয়ের বই বের হয়নি। তবে বাবা ও ছেলের বই ঠিক বের হয়েছে। যিনি বের করেছেন তিনি হলেন প্রখ্যাত জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক 'দীপু মাহমুদ' আংকেল। উনি উনার দুই ছেলেসহ বই বের করেছেন।

যাক বইয়ের কথা, এবার আসি সাইকেল-এর কথা নিয়ে। মানে সাইকেলের গল্প নিয়ে। এই গল্পটা আমার রৌদ্র আপুকে নিয়ে।

আপু যখন স্কুলে পড়ে তখন পিইসি আর জেএসসি পরীক্ষা ছিল না। আপু ৮ম শ্রেণি পাস করার পরের বছর জেএসসি পরীক্ষা চালু হয়। ক্লাসে ভালো ছাত্রী হিসেবেই আপুর নামডাক ছিল। আমি এখন সেই স্কুলেই পড়ি। একটা বিষয়ে বড়োরা ভালো করলে ছোটোদের কিন্তু ভালো করতেই হয়। একটু খারাপ করলে মিসরা বলেন...

- তোমার আপু তো অনেক ভালো ছিল, এই ছিল। সেই ছিল। আরো কত কী?

তাই আমাকে সবসময় ভালো করতে হয়। তবে আম্মু ক্লাসে ১ম, ২য় হতে না বললেও বলেন ফলাফল ভালো যেন হয়।

আমাদের স্কুল থেকে প্রতি বছর 'বালাকা' নামে বিশাল আকারের ম্যাগাজিন বের হয়। আমরাই লিখি। প্রতি বছর আমার লেখা থাকে। আপুও লিখত আগে। মজার বিষয় হলো অভিভাবকদের পক্ষ থেকে প্রতি বছর আম্মুর একটা লেখাও থাকে।

এবার আসি সাইকেলের গল্পে, আপু যখন এসএসসি পরীক্ষা দেয়, আম্মু বলে- তুই পরীক্ষায় ভালো করলে তোকে একটা বড়ো শোকেস কিনে দিবো। যেটা হবে ঘরোয়া লাইব্রেরি।

আপু তো মহা খুশি। আপু ভালো পাস করেছে, আম্মুও কথা রেখেছে। যেদিন রেজাল্ট বের হয় সেদিনই আম্মু আব্বুসহ সবাই মিলে বসুন্ধরা সিটির সামনে গিয়ে বড়ো একটা শোকেস কিনে নিয়ে আসি। আনার সাথে সাথেই আমরা বইগুলো সাজাতে শুরু করি। বইগুলো নাম্বারিং করা। অবশ্য সেদিন আমার জন্যে নতুন পড়ার ডেস্কও আনা হয়।

আমরা দুই বোন অনেক বই পড়ি। আমাদের ঘরে অনেক বই। এরই মাঝে সেই লাইব্রেরি ভরে গেছে। আম্মুর লাইব্রেরি কিন্তু আলাদা।

আপু কলেজে ভর্তি হলো। ভালোই লেখাপড়া চলছে। কলেজের মাঝামাঝিতে আপু আম্মুকে বলে-

- এবার ভালো ফলাফল করলে কী দিবে আম্মু?

- নিশ্চয়ই ভালো কিছু দিবো।

- না, এবার আমি নিজেই চাইব।

- ঠিক আছে, আগে ভালো ভাবে পাস করো।

আপু তো লেখাপড়া করেই যাচ্ছে। প্রায় আপুকে জিজ্ঞেস করি-

- আপু তুই এবার কী চাইবি?

ও আমাকে বলতেই চায় না। বারবার জিজ্ঞেস করেছি। বলেই

না। একদিন আপু আমাকে একটা কাজ করতে বলে। আমি বললাম-

- আগে আমাকে বলো ভালো পাস করলে আম্মুর কাছে কী চাইবে।

আপু বলতে বাধ্য হলো। রুমে আমি আর আপু ছাড়া কেউ নেই। তবুও আপু চুপিচুপি কানে কানে বলে-

- আম্মুকে বলব একটা সাইকেল কিনে দিতে। আমার সাইকেল চালানোর খুব শখ।

- কী বলিস আপু। তুই কলেজ পাশ করে সাইকেল চালাবি। এটা তো আগেই চাইতে পারতি।

- দূর বোকা। কেমনে চাইতাম। তখন যে লাইব্রেরির খুব দরকার ছিল, বইগুলো অযত্নে-অবহেলায় এদিক-ওদিক ছিল। মা ওটা দিয়েছে, তখন তাতেই খুশি ছিলাম। তবে এখনকার মতো পিইসি, জেএসসি থাকলে ঠিক চাইতে পারতাম।

-আপু তুই সাইকেল না চেয়ে একটা স্কুটি চাইতে পারিস।

-তুই যে কী বলিস, সাইকেল দিতে রাজি হয় কি-না ঠিক নেই। তুই বলিস স্কুটির কথা।

কথাটা বলে আপু নিষেধ করে দেয়, যেনো কাউকে না বলি। কিন্তু আমি তো কথা পেটে রাখতে পারি না। এমন কথা পেটে থাকলে কেমন জানি লাগে। তবুও আপুর বকা আর মাইরের ভয়ে কাউকে বলিনি।

আপুর পরীক্ষা শেষ। ভালো পাস আসলো। আপু আম্মুকে সাইকেল কেনার কথা বলল। আম্মু তো শুনে একেবারেই চুপ। কারণ আব্বু কোনোমতেই সাইকেল কিনতে রাজি হবে না। আম্মু আপুকে বোঝাতে লাগল,

দেখ তুই চালাতে জানিস না। কিনে কী হবে?

জায়গা নেই, তুই কই চালাবি?

তুই সাইকেল চালিয়ে কই যাবি?

তোর আব্বু গাড়ি কিনেছে, গাড়ি রেখে কী তোকে সাইকেলে যেতে দিবে?

তুই বড়ো হয়েছিস, সাইকেল কেমনে চালাবি?

এমন এমন অনেক কথা। আসলে আম্মু চায় কিনে দিতে, কিন্তু আব্বু দিতে দিবে না বলেই আম্মুর এত কথা। তার উপরে আপু একটুও দায়িত্বশীল নয় বলেই ওকে নিয়ে ভয় বেশি।

আপুর সাইকেল কেনার ইচ্ছা মনে থাকলেও তা আর বেশি বলতে পারেনি।

আপু বলতে শুরু করল সে স্কুটি কিনবে। আপু সিএ পড়া শুরু করল। খালা-মামাদের বলল, কিন্তু কেউ রাজি হয় না। আপু বলে বসলো-

-আমি আমার টাকা দিয়েই কিনব।

আপু নিজেই টাকা জমাতে শুরু করল। কিন্তু টাকা সে জমাতে পারে না। একটু জমা হলেই খরচ করে ফেলে। ওর জন্মদিন আসলে সবাই বলে-

-কী দিব কী দিব।

আপু বলে-

-সবাই টাকা জমিয়ে আমাকে স্কুটি কিনে দাও।

কিন্তু কেউ দেয় না। আপু গাড়িতে করেই সিএ ফার্মে যাওয়া-আসা করে। আম্মু আপুকে ব্যায়াম করতে বলে, কিন্তু আপুর সময় কই। সে সকাল ৮ টায় যায়, কখনো সন্ধা ৬/৭ টায় আসে। আবার কখনো আসতে রাত ৯টা বাজে। এসে খেয়েই মোবাইল নিয়ে বসে, তারপর ঘুম। নিজে নিজে আবার বুদ্ধি করল আপু। মাকে বলে-

- তুমি যে বলো ব্যায়াম করতে, কিন্তু আমার সময় কই। তুমি আমাকে সাইকেল কিনে দাও। আমি সাইকেল চালিয়ে সিএ ফার্মে যাব আসব, তাতেই আমার ব্যায়াম হয়ে যাবে।

আম্মু পড়েছে মহা এক সমস্যায়। আপুকে বলে-

- তুমি বড়ো হয়েছো। ইচ্ছার কথাটা তুমি নিজেই তোমার বাবাকে বলো। সে যদি রাজি হয়, আমার আপত্তি নেই।

আম্মু জানে আব্বু কখনোই রাজি হবে না। আর আপুও সাহস পায় না আব্বুকে বলার।

আমার পিইসি পাস করার পর আপু বলে আমায় কিছু দিবে। চেয়েছিল সাইকেল দিতে। এখানেও আব্বুর বাধা। তবে সাইকেল আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আপুর জন্যে খারাপ লাগে, আফসোসও হয়। ওর এত ইচ্ছা, এত সখ, তবুও ও একটা সাইকেল পেলো না।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যদি বড়ো হতাম তাহলে ওকে ঠিক একটা সাইকেল কিনে দিতাম। কিন্তু তখনো তো আম্মু-আব্বু বাধা দিত। আমি জানি আম্মু-আব্বু চায় আমরা অনেক কিছু করি, কিন্তু ভয়ও পায়। উনারা যেমন আমাদের ভালো চায়, তেমনি আবার ভয়কে জয় করব কী করে যদি তা না করি। পরিশেষে আপুকে বলি-

- আপু তুই সাইকেলের শখটা বাদ দিয়েই দে। এমন শখ কর যা পূর্ণ হবে।

৭ম শ্রেণি, বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জেলখাঁও, ঢাকা।

চার চাকার সাইকেল

ইন্তিসার ইমরান (রাইসা)

জানো কি বন্ধুরা? আমি না সাইকেল চালাতে দারুণ পছন্দ করি। দুই বছর আগে আমার একটি চার চাকাওয়ালা সাইকেল ছিল। চার চাকার কথা শুনে অবাক হলে? সাইকেলের আবার চার চাকা হয় কীভাবে? হয়, হয়! প্রধান সাইকেলটি দুই চাকারই, পেছনের চাকার সাথে দুটি ছোটো চাকা লাগানো, সেটা মিলে মোট চার চাকা। যারা নতুন সাইকেল চালানো শেখে, তারা যাতে পড়ে না যায়, তাই দুটি অতিরিক্ত ভারসাম্য চাকা সাইকেলে লাগানো থাকে। তো, আমি খুব মজা পেতাম চালিয়ে। প্রথমে শুধু বাসার সামনে উঠোনের মতো খোলা জায়গায় চালাতাম। পেছন পেছন থাকত আব্বু আর আম্মু। মনে আছে, প্রথমবার যখন প্যাডেল ঘুরাতে যাব, পায়ের উপর সে কী কষ্ট! আমার স্যান্ডেলটা না পিচ্ছিল ছিল, তাই দুই-তিন বার চেষ্টা করেও প্যাডেল ঘুরাতে পারিনি। এরপর আরেকটি স্যান্ডেল নিলাম এবং প্যাডেল ঘুরাতে পারলাম। দেখি আমি একটু একটু করে সামনে যাচ্ছি, চাকাও আগাচ্ছে। দারুণ মজা!

ঐ সাইকেলটি ছিল কমলা এবং কালো রঙের। সাইকেলের সিটে ছিল স্পাইডারম্যানের ছবি, আর অন্য সব জায়গায় টম অ্যান্ড জেরি কার্টুন না কী যেন ছিল। সব মিলিয়ে দারুণ সুন্দর একটি সাইকেল। আমি খুব যত্ন করতাম। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বারান্দায় গিয়ে দেখে আসতাম আমার সাইকেল কেমন আছে, এরপর চোখ বুজতাম। আবার সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে আরেকবার দেখতাম। খুব আনন্দ জাগত। বিকেলে সবচেয়ে মজা লাগত। কারণ বন্ধুদের সাথে সাইকেল নিয়ে খেলতাম, তাদের দেখাতাম। এরপর আমি ক্লাস থ্রিতে উঠলে, বার্ষিক পরীক্ষার শেষে আরেকটু বড়ো নতুন একটি সাইকেল দিলো আমার বিচারক মামা। এবার তো একটু ভয় ভয়! কারণ, ঐ সাইকেলে তো দুই চাকা। ছোটো দুটি চাকাই নেই! মামা শীতের বিকেলে আমাকে উঠার জন্য বললেন, কিন্তু আমার সাহসে কুলায় না। আম্মুর কোলের ভিতর ঢুকে পড়লাম, আর বললাম- এই সাইকেল আমি চালাবো না! কিন্তু আমার রাগি মামা আমাকে একটু জোর করে সাইকেলে বসিয়ে দিলেন, এরপর বললেন প্যাডেল ঘুরাতে। আমি বললাম- মামা তুমি ধরে রেখো, আমি যেন পড়ে না যাই। আমি দুই কি তিনটা প্যাডেল মেরে দুই হাত সামনে আগালাম। এরপর মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম মামা পেছনে আছে কী না। ওমনি সাইকেলসহ আমি চিৎপটাং। হাতে এবং হাঁটুতে হালকা ব্যথা পেলাম, ময়লার দাগ লেগে গেল আমার প্যান্টে। যদিও শরীরে কাটেনি, তবু যে ভয় পেয়েছিলাম তাতে আর পরের ৭ দিন সাইকেলের কাছেও যাইনি। দুই সপ্তাহ পরে অবশ্য আমার ভয় একটু করে কমতে লাগল। বড়ো সাইকেলটি চালানোর কৌশল রপ্ত করে ফেললাম। এখন অবশ্য মজাই লাগে, যদিও মূল রাস্তায় বা দূরে যেতে পারি না। তবু আমাদের লম্বা উঠোনে সাইকেল চালাই দারুণ মজায়। বৃষ্টির দিনে পারি না, শুধু শুষ্ক দিনে চালাই।

চতুর্থ শ্রেণি, মালেকা একাডেমি, গোপালগঞ্জ

সাইকেল সন্দেশ

মেজবাউল হক

*চলে আমার সাইকেল হাওয়ার বেগে উইড়া, উইড়া....*হ্যাঁ বন্ধুরা, সাইকেলকে নিয়ে এই গানটি তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। না শুনে থাকলে বাবা-মায়ের কাছ থেকে শুনে নিতে পারো। তোমরা জানো, বাইসাইকেল অতি পরিচিত এবং অনেক জনপ্রিয় একটি বাহন। আর হবেই বা না কেন, এটি একদিকে যেমন পরিবেশ বান্ধব তেমনি সাশ্রয়ী পরিবহণ ব্যবস্থা। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে সাইক্লিং শব্দটি এখন অনেক জনপ্রিয়। এছাড়া যানজটের শহর ঢাকাতে চলাচলের সঙ্গী হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সাইকেল। বাংলাদেশের তৈরি সাইকেল এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। তাইতো সাইকেল নিয়ে মজার তথ্য তোমাদের জন্য :

সাইকেল চালিয়ে পৃথিবী দেখা

পরিবেশ দূষণ, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এইডস প্রতিরোধ, মাদক নির্মূল, দুর্নীতি রোধসহ নানা সামাজিক বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির জন্য দেশ থেকে দেশে সাইকেল চালিয়ে ছুটে চলেছেন এক বাংলাদেশি তরুণ। তার নাম আবুল হোসেন আসাদ। সাইকেল চালিয়ে পৃথিবী দেখার অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ নিয়ে ইতিমধ্যে ৪২টি দেশ ঘুরেছেন তিনি। দেখেছেন দেশে দেশে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। গোপালগঞ্জের 'সাইক্লিস্ট আসাদ' পৃথিবীটা চক্কর দেওয়ার পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে দেশের বাইরে যাত্রা শুরু করেন। সাইকেলে প্রথমে ভ্রমণ করেন ভারতে। এক দেশ থেকে আরেক দেশের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বহু ঝক্কি পেরিয়ে একে একে ৪২টি দেশে পা ফেলেছেন বাংলাদেশের এই সাইক্লিস্ট।

বাঁশের সাইকেল

বন্ধুরা, আজ তোমাদের অন্য রকম এক বাইসাইকেলের কথা জানব, যেটা কিনা বাঁশ দিয়ে তৈরি। অবাক হচ্ছো কিন্তু এটাই সত্যি। বাংলাদেশের তরুণেরা সাইকেলের ফ্রেম নির্মাণ করছেন অভিনব পদ্ধতিতে, বাঁশ ব্যবহার করে। নির্মাতাদের মধ্যে একজন হলেন সজীব বর্মণ, পড়ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে। আরেকজন হলেন সানজিদুল ইসলাম ইমন, পড়ছেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ।

বাঁশের সাইকেল তৈরি করার এই ধারণা নতুন নয়। বাঁশ দিয়ে বাইসাইকেল তৈরি করা হচ্ছে বহু আগে থেকে। এটি একদিকে যেমন জ্বালানি ব্যবহারের ঝুঁকি কমিয়ে পরিবেশকে রক্ষা করছে আবার বাঁশের তৈরি হওয়ায় স্টিলের ব্যয়ও রোধ হচ্ছে। এ জাতীয় সাইকেলের সহনশীল ক্ষমতা অনেক বেশি ও সাশ্রয়ী। ওজনও অনেক কম। সুবিধামতো ডিজাইন করা যায়। বাঁশ দিয়ে যেমন সাধারণ ব্যবহারের জন্য বাইসাইকেল তৈরি করা যায় তেমনি রেসিং বাইসাইকেল এমনকি মাউনটেইন বাইসাইকেলও তৈরি করা যায়। ছোট্ট বন্ধুরা, নিবে নাকি এরকম একটি সাইকেল?

সাইকেল ভ্রমণে গুগল ম্যাপ

সম্প্রতি ইউরোপের ছয়টি শহর জার্মানি, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ এবং লিকটেনস্টাইনের জন্য গুগল ম্যাপসে যুক্ত হয়েছে বাইসাইকেল চালানোর পথ নির্দেশনা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে সাইকেল জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় গুগল ম্যাপ এমন উদ্যোগ নিয়েছে। এর মাধ্যমে সাইকেল নিয়ে মানচিত্র অনুযায়ী পছন্দের রাস্তা খুঁজে নেওয়া যাবে।

গুগলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মূলত ব্যস্ত সড়ক এড়িয়ে সাইকেল চালকেরা যাতে সাইকেলের পথ ব্যবহার করেন সে জন্যই এমন উদ্যোগ। নতুন এই সেবায় জায়গার নাম বলেও দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

প্রাথমিকভাবে চালু হওয়া এ পদ্ধতিতে থাকছে তথ্য যোগ করা ও সম্পাদনার সুযোগ। আগ্রহীরা চাইলে নিজেদের তথ্যও জানাতে পারবেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিবেশের কথা ভেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলাচলের জন্য বাইসাইকেল বেশ জনপ্রিয়। আর এ বিষয়টিকেই গুগল ম্যাপে যুক্ত করে সাইকেলপ্রেমীদের বিশেষ সহযোগিতায় এগিয়ে এল গুগল। এরই মধ্যে উদ্যোগটি বেশ প্রশংসিতও হয়েছে।

সাইকেলের শহর

ঢাকাকে যদি রিকশার শহর বলা হয়ে থাকে, তবে দুই চাকা বা সাইকেলের শহর বলা যেতে পারে নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামকে। নেদারল্যান্ডসের প্রায় ৩৬ শতাংশ মানুষ তাদের বাহন হিসেবে সাইকেলকে বেছে নিয়েছে। আর মাত্র ১১ শতাংশ মানুষ পাবলিক পরিবহণের ওপর নির্ভরশীল। শুনে অবাক হচ্ছো নিশ্চয়ই বন্ধুরা!

শুধু তাই নয়, সাইকেল চালকদের জন্য রয়েছে রাস্তায় আলাদা লেন ও পথ। আরো রয়েছে সাইকেল পার্কিংয়ের জন্য সুব্যবস্থা। নেদারল্যান্ডসে যে তিনটি শহরে সাইকেলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে গ্রোনিনগ্যানে প্রায় ৩১ শতাংশ, জোয়ালা শহরে প্রায় ৪৬ শতাংশ আর অ্যামস্টারডামে প্রায় ৩৮ শতাংশ মানুষের প্রথম পছন্দ সাইকেল। নেদারল্যান্ডসের প্রতি আটজনের মধ্যে সাতজনই সাইকেলের মালিক। আর এদের অধিকাংশের বয়স ১৫ বছরের বেশি।

নতুন সাইকেল ভাড়া নেওয়া থেকে শুরু করে কোন পথে কীভাবে সাইকেল চালানো যাবে, তার নির্দেশনা এবং সতর্কতা পর্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা নিয়ে রয়েছে সাইকেল স্মরণিকা।

ঘুঙুরের হোমওয়ার্ক

ঝর্ণা দাস পুরকায়স্থ

আবিদ অফিসে চলে যাবার সাথে সাথেই ঘুঙুরের পড়া শেষ। আব্বু কাজে গেছেন। তার মানে বেশ বেলা হয়ে গেছে। ছোটোরা আর কতক্ষণ পড়বে? অবশ্য বড়ো মামু –ছোটো চাচু কেউ আর ওকে ছোটো বলে না। কে.জি.–তে যখন পড়ত তখন বাড়ির সবাই আদর করে পিচ্চি ডাকত। ক্লাস ওয়ান-এ উঠার পর সবাই বলল- ঘুঙুর, এবার কিন্তু উঁচু ক্লাসে উঠেছো, ভালো করে পড়াশোনা করবে।

ছোটো বোন ঝুমুরকে কেউ কিছু বলে না। ও বাবা দাদা বলতে পারে শুধু, টলোমলো পায়ে অল্প অল্প হাঁটে। হুমড়ি খেয়ে মাঝে মাঝে পড়েও যায়। খুব ভালো আছে ও, কেউ ওকে পড়তে বলে না। ওর যা ভালো লাগে তাই করে। ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টু-তে উঠার পর খালামনি তিতির আন্টি বলল, এবার কিন্তু বড়ো ক্লাসে উঠেছো ঘুঙুর, মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। মে মাসের তিন তারিখে ওর জন্মদিন, সিক্স প্লাস হবে। একটু একটু করে বড়ো হচ্ছে ও, খুব খুশি। নতুন বই এসেছে, চমৎকার রং-বেরঙের ছবির বইগুলো যত্ন করে চকচকে লাল রঙের ব্যাগে তুলে রাখে। বিছানায় বেড কভার টানটান করে পেতে দেয় শিরিন। এরপর ঝাড়ন নিয়ে দেয়াল- ছাদের দিকে তাকিয়ে বলে, ইসস্-কী ঝুল জমেছে বাব্বা। এত মাকড়সার জাল? মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি আবার হাঁ করে তাকিয়ে আছো কেন? পড়া শেষ? ঘুঙুর বইয়ের ব্যাগ গুছিয়ে সবে মিকি মাউস, বারবি ডল আর টেডি বিয়ার সাজিয়ে বসেছে। মায়ের কথা শুনে কান্না পেতে থাকে। আব্বু অফিসে চলে গেছে, বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ উঠেছে, বুয়া মুরগি আনতে বাজারে গেছে, তার মানে বেশ বেলা হয়েছে এবার আর কীসের পড়া? ঝুল ঝাড়তে ঝাড়তে শিরিন বলে, হোমওয়ার্ক নেই? আবার বিচ্ছিরি শব্দগুলো শোনে ঘুঙুর। আরে বাবা- স্কুলে কী পড়ি না? ইংরেজি, বাংলা, ম্যাথস সবকিছুই তো পড়ি, বাড়িতে এসেও আবার হোমওয়ার্ক করতে হবে? বাড়িতে খেলব না? বাড়িতেও পড়াশোনার কাজ করতে হবে? নতুন ক্লাসে উঠেছে, পড়াশোনা তেমন ভাবে শুরু হয়নি বলে আজ ছুটি। তবে ক্লাস টিচার জেনিফার ম্যাম বলেছেন, বাড়িতে বসে শুধু হাউজ অ্যান্ড সিক খেলবে না। হোমওয়ার্ক গুলো ঠিকঠাক মতো করে আনবে। ঝুমুর

প্লাস্টিকের পুতুল কামড়াচ্ছে আর খিলখিল করে হাসছে। খুব মজা ওর, ওকে হোমওয়ার্ক করতে হয় না। বাংলা খাতা খুলে বসে ঘুঙুর।

লিখতে হবে আমার পোষা বিড়াল। আমার তো পোষা বিড়াল নেই, কী লিখব তাহলে? আম্মু, -ও আম্মু, আমরা বিড়াল পুষি না কেন? চোখ পাকিয়ে শিরিন বলে, এ আবার কেমন প্রশ্ন ঘুঙুর? বাইরের এক বিড়াল এসে কিচেনের জানালা দিয়ে ঢুকে মাছ ভাজা খেয়ে নেয়, দুধের ডেকচি ফেলে দেয়– বলপেন কামড়ে ধরে ঘুঙুর বসে থাকে। শিরিন বলে, লিখছ না কেন? বিড়াল রোজ এসে আমাদের বিন উলটে ফেলে দেয়। বিড়াল তো রোজ দেখছ। তা তো দেখি আম্মু, আমি তো কাছ থেকে দেখিনি। ওর চারটে পা, একটি লেজ, সোনালি চোখ আর ছোটো ছোটো দুটি শিং আছে। বলছিস কী রে ঘুঙুর? বিড়ালের শিং! আঁতকে উঠে শিরিন। লোকে শুনলে হাসবে যে। শুনছ আম্মা, তোমার নাতনি কী বলছে? শিরিনের মা আটদিনের জন্য রাজশাহী থেকে ঢাকা বেড়াতে এসেছেন। বলেন, তাই তো শুনলাম। লজ্জা পেয়ে ঘুঙুর বলে, বাড়িতে না পুষলে আমি কী সবকিছু লিখতে পারি? নানি বলেন, হাতি নিয়ে পাঁচ লাইন লিখতে দিলে বাড়িতে কী হাতি পুষতে হবে? বলছিস কী ঘুঙুর- অ্যাঁ? হাসির ঝড় ওঠার সাথে সাথে মিইয়ে ঘুঙুর, ঝুমুরও হাসতে থাকে ওদের সাথে সুর মিলিয়ে। মাই গড ! কী যে বোকা বোকা কথা বলি আমি? আপন মনে বলতে থাকে ঘুঙুর। ভীষণ লজ্জা পায় সে। অঙ্ক-ইংরেজির সময় টিচাররা হাসিমুখে ছাড় দেন।

ম্যাথস হলো হিসেবনিকেশের ব্যাপার, ঠান্ডা মাথায় কষতে হয়। একটু এদিক ওদিক হলে নির্ঘাত ভুল। ইংরেজি হলো বিদেশি ভাষা। কিন্তু বাংলার সময় নো ছাড়। জেনিফার ম্যাম বলেন, বাংলা হলো আমাদের মাতৃভাষা, মাদার টাং, ভাষার জন্য কোনো জাতি প্রাণ দিয়েছে এমন নজির কী আছে? শুনেছো তোমরা? ক্লাস টু- এর ছেলে- মেয়েরা চেঁচিয়ে বলে, নো ম্যাম। তাহলে তোমরা নিজের ভাষা ভালো করে শিখবে না কেন? প্রচুর পড়বে, অনেক লিখবে, হাতের লেখা প্র্যাকটিস করবে। আটকে গেলে আব্বু আম্মুকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে- কেমন? তাই তো করছে ঘুঙুর। আম্মু চকলেট কেক বানাচ্ছে, ঝাড়ন দিয়ে মাকড়সার জাল পরিষ্কার করছে, ফোনে কথা বলছে- সব ঠিকঠাক, যেই না ঘুঙুর বলল ও আম্মু, আমার বাড়ি নিয়ে কী লিখব বলো তো, বলে দাও না একটু। অমনি মা – আহ্ ঘুঙুর, ছবি আঁকো গে যাও, বিরক্ত করো না। আব্বুর তো সময় নেই, সময় নেই – রব ট্যুর-এ যাচ্ছে হরদম, বিদেশে কনফারেন্সে যাচ্ছে – ফেরার সময় কত কিছু নিয়ে আসে ঘুঙুর আর ঝুমুরের জন্য। ছবির বই, রং পেনসিল, চকোলেট সবই ঠিক আছে, কিন্তু ওর হোমওয়ার্কের কী হবে? বাড়ির কাজ আর এগোয় না ওর। আব্বু বলেন, একটু রেস্ট করি ঘুঙুর। ওকে আব্বু। রেস্ট করার পর মেহমান আসে, তারপর ডিনারের সময় আর রইল কোথায়? জেনিফার ম্যামের দেওয়া হোমওয়ার্কের কী হবে? টিটো, শাওন, রুমকি, ঝিমলি, মেঘ ওরা নিশ্চয়ই কমপ্লিট করে ফেলেছে। কান্না পায় ওর, মা-বাবা বোঝে না কেন? ভোরবেলা উঠে জানালার পাশে লিখতে বসে গালে পেন্সিল ঠেকিয়ে ভাবতে থাকে ঘুঙুর।

ম্যাম বলেছে, 'পোষা বিড়াল' নাকি খুব ভালো লিখেছে শাওন, এবার নিশ্চয়ই ঘুঙুরেরটা ভালো হবে। ও লিখে আমার আব্বু আম্মু খুব ব্যস্ত। আমাকে পড়া দেখিয়ে দেবার সময় নেই। একেক সময় মা-বাবার খুব ঝগড়া হয়, তখন খুব খারাপ লাগে। আমি একা একা বসে কাঁদি। ছোটো বোন ঝুমুর খুব ছোটো, ওর সঙ্গেও কথা বলতে পারি না। তাই স্কুলে আমার ভালো লাগে। সবার সাথে টিফিন ভাগ করে খাই, শাওনের বিন্নি চালের পোলাও, রুমকির ফুলঝুরি পিঠা-ওফ্ দরুণ, ইয়ামি, ফ্যানটাসটিক। জেনিফার ম্যাম সবার খাতা দেখে মিটিমিটি হাসেন। ঘুঙুরের দিকে তাকিয়ে বলেন, কী ব্যাপার, সাবেরী আমার বাড়ি লিখতে গিয়ে স্কুল টিফিনে চলে এসেছে? যা লিখবে তাতে তুমি স্টে করবে, আই মিন দাঁড়িয়ে থাকবে। তাহলে কী আমার লিখাটা ভালো হয়নি? ভেতরে ভেতরে মন খারাপ হতে থাকে ওর। বাড়িতে ফিরেও মন ভালো হয় না ঘুঙুরের, কী যে এক হোমওয়ার্কের চক্করে পড়ল।

আরে বাবা স্কুলে কী পড়ি না? সারাক্ষণ পড়ি তাহলে আর বাড়ির কাজ দেখা কেন বাপু? তিন দিনের ছুটি থাকায় ম্যাম হোমওয়ার্ক দিলেন আমার গাঁ, আমার গাঁয়ের নদী পুকুর। দুপুরে খাবার পর শিরিন বলে, হোমওয়ার্কের খাতা নিয়ে এসো ঘুঙুর। ঝুমুর ঘুমিয়ে গেছে। সুনসান দুপুর। সত্যি মেয়ের পড়াশোনা সেভাবে দেখতেই পারে না শিরিন। খাতা খুলে আম্মু বলে, এ কী ঘুঙুর! আমার গাঁ আমার গাঁয়ের নদী বা পুকুর। তোর ম্যাম কি অন্য টপিক খুঁজে পায় না? কেন আম্মু, কী হলো? আমি তো কখনো গাঁয়ে যাইনি সোনা। সেভাবে পুকুর তো দেখিনি। ঘুঙুর আঁতকে উঠে, তাহলে কী হবে আম্মু? মুশকিল আসান করে

দিল শিরিন। তোর ড্যাডি আসুক। সব জানে তোর আব্বু। হ্যাঁ ড্যাডি আসলে এক পলকে সব লেখা হয়ে যাবে। আব্বুরা সব পারে। খুব নিশ্চিন্তে ঘুঙুর ঈগলু আর মিঃ বিংগো নিয়ে খেতে থাকে। টেডি বিয়ারটা কুঁতকুঁতে চোখ নিয়ে তাকাচ্ছে, যেন বলছে, খাচ্ছো খাও ঘুঙুর, দু' একটা তো দেবে। একা একা খিলখিল করে হেসে উঠে ঘুঙুর। অফিস থেকে জাহিদ ফিরে এলে ছুটে যায় ও। ড্যাডি, ড্যাডি, আব্বু। শিরিন বলে, তোমার ড্যাডি বিশ্রাম নিক। চা-টা খেয়ে যখন বসবে তখন কথা বলো চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে। জাহিদ ডাকেন, এসো ঘুঙুর, কী বলবে বলো।

আমাদের গাঁয়ের নদীর নাম কী ড্যাডি? খবরের কাগজ হাতে নিয়ে জাহিদ বলেন, ওরেব্বাস কতকাল গাঁয়ের বাড়িতে যাইনি। কী যেন নাম ছিল, কিছুতেই তো মনে পড়ছে না। আচ্ছা ঘুঙুর, নদীর নাম দিয়ে তুমি কী করবে? শিরিনের কথায় বিরক্তি। এগুলো তোমার মেয়ের স্কুলের হোমওয়ার্ক। আজ এটা, কাল সেটা, তারি এক জ্বালা হয়েছে তো ! ক্লাস টিচার জেনিফার ম্যাম আছে না। উনিই হোমওয়ার্ক দিয়েছেন। খালাতো ভাই টুটুলকে জিজ্ঞেস করেন ড্যাডি। এই টুটুল, আমাদের গাঁয়ের নদীর নাম কিরে? ভাইয়া বিদেশ গিয়ে গিয়ে তুমি কী নিজের নদীর নাম ভুলে গেছো? বোলাই নদী, বোলাই। ঘুঙুর নদীর নাম বোলাই লিখ। রাবার, পেনসিল, বলপেন নিয়ে ঘুঙুর বসে। দারুণ এক হোমওয়ার্ক করতে বসেছে ও। পুকুরের কথা কী লিখব ড্যাডি? আহ! ঘুঙুর লিখ পুকুরে পানি থাকে, পানি তিরতির করে বয়। এই শিরিন কী করছ? মেয়ের হোমওয়ার্কটা করিয়ে দিতে পারো না?

শিরিন এসে বলে, তুমি খবর শুনবে, আমি সিরিয়াল দেখব না? মেয়েকে আমি পড়াবো, তুমি পড়াতে পারো না? ও আম্মু, ও আব্বু, ও বাবি আদুরে গলায় ঘুঙুর বলতে থাকে, তোমরা দুজনে ঝগড়া করো না আম্মু, আমি নিজেই করে নেবো। স্টপ করো, আমাকে হোমওয়ার্ক করিয়ে দিতে হবে না। মা-বাবার চড়া গলা শুনে ঝুমুর ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। পুকুরের পানি তিরতির করে বয়। শুধু এই? তারপর কী লিখব? হ্যাঁ এই তো বছর খানেক আগে ইংল্যান্ডে বেড়াতে গেছিল, ঘুঙুর ছোটো তাও মনে আছে, টেমস নদীর তীরে দাঁড়িয়েছিল ওরা, হু হু করে হাওয়া বইছিল, হঠাৎ ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নেমেছে, নানা দেশের লোক, কত রঙিন ছাতা সবাই বলছিল,

ওয়ান্ডারফুল, হাউ নাইস, ভেরি চার্মিং। এখনো চাপা গলায় ঝগড়া শোনা যাচ্ছে, আম্মু আব্বুকে এখন কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না। ঘুড়ুর লিখে বাড়ির লাগোয়া পুকুরের সামনে সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। আমরা বলি কী সুন্দর পুকুর, কী চমৎকার। পুকুর চুপ করে থাকে, আমরাও চুপ করে থাকি। বড়োরা না বললে ও কী আর হোমওয়ার্ক করতে পারে না? খুব পারে। ঝগড়ার পর আব্বু ভাবলেন, সত্যিই তো ঘুড়ুরকে নিয়ে একবারও কেন গাঁয়ের বাড়িতে গেলাম না? নিজের গ্রামকে চেনা-জানা তো খুব দরকার। জেনিফার ম্যাম হোমওয়ার্ক না দিলে তো ব্যাপারটি মাথায়ই আসত না। মা মনি, জ্বি আব্বু (খুব খুশি হলে ড্যাডিকে আব্বু ডাকে ঘুড়ুর) হোমওয়ার্ক করবে না? খুশিমাখা গলায় ঘুড়ুর বলে, নিজে নিজে করে ফেলেছি আব্বু। ওহ্ দ্যাটস গুড, গুড গর্ল। থ্যাংক ইউ ড্যাড। প্যারেন্টস কল করা হলো। জাহিদ অফিস থেকে যেতে পারেন না, শিরিনই বরাবর যায়। কী ঝামেলায় যে পড়া গেল! শিরিন বলতে থাকে, কী করেছ তুমি ঘুড়ুর? স্কুল থেকে কল করবে কেন? হয় পরীক্ষায় খারাপ করেছ নয়ত দুষ্টুমি করেছ একটা তো হবেই। আমি আবার কী করলাম?

মনে মনে ভাবতে থাকে ঘুড়ুর। দুদিন পর ক্লাসরুমের জানালা দিয়ে ওরা দেখতে পায় টিটো, শাওন, ঝিমলি, মেঘ আর ঘুড়ুরের আম্মু এসেছেন। প্যারেন্টস কল কী আজকেই ছিল? ব্যাপারটা কী? ও বাবা! অবাক ওরা, সবাই মিলে কী দুষ্টুমি করলাম আমরা? টিচার্স রুমের বাইরে গিয়ে ওরা চুপিচুপি দাঁড়ায়। জেনিফার ম্যাম এর সাথে অন্য ম্যামও রয়েছেন, আপনারা তো ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা একদম করেন না। আমরা করি না? বলছেন কী ম্যাম? কি করে বুঝলাম জানেন? গাঁয়ের নদী সম্পর্কে হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম, সাবেরী লিখেছে। নদী তিরতির করে বয়ে যায়। ব্যস আর কিছু লেখার নেই। নদীতে পাল তুলে পানসি নৌকা যায়। ছোটো ছোটো কোষা নৌকা বেয়ে বেয়ে মাঝিরা গান গায়, নদীতে মাছ থাকে, টুপটাপ বৃষ্টি ঝরলে নদীকে আরো চমৎকার দেখায়, এতে আকাশের ছায়া পড়ে কিছুই তো লিখেনি আপনাদের ছেলে-মেয়েরা। দ্যাট মিনস্ আপনারা ওদের হেল্প করেননি। আমাদের বাড়ি, লিখতে দিয়েছি, বাড়ির চেয়ে বেশি লিখেছে মা-বাবার কথা। আব্বু-আম্মু ঝগড়া করেন, আমাকে পড়া দেখিয়ে দেয় না ওরা। আমার মন খুব খারাপ হয়। লিখেছে শাওন, মেঘ আর সাবেরী। ঘুড়ুরের স্কুলের নাম সাবেরী হোসেন। মাথা নিচু করে বসে থাকে শিরিন। কী লজ্জার কথা! ছি! ছি!। মায়েরা চুপ করে বসে থাকেন। পুকুর নিয়ে লিখতে দিয়েছি, কেউ ভালো করে তাও লিখতে পারে নি। একমাত্র জোনাকি চমৎকার করে লিখেছে। পুকুরে হেলেঞ্চা কলমী শাক জন্মায়, শাপলা ফুল ফোটে, অনেক পুকুরে পদ্ম ফুলও ফোটে। ব্যাঙাচির জন্ম হয়। জোনাকি মেয়েটি খুব সুন্দর করে লিখেছে। ম্যাথস এর ম্যাম জুলেখা বলেন, ওদেরকে নিয়ে গাঁয়ের বাড়িতে যান না? প্রকৃতিকে তো জানতে হবে ওদের। কোথায় আর যাওয়া হয়, শিরিন আর শাওনের আম্মু শিলা বলেন, ওদের আব্বুর বদলি, ছুটি নেই, বিদেশে ট্যুর। তাছাড়া অসুখবিসুখ তো লেগেই আছে। ইচ্ছে তো করে গাঁয়ে যেতে কিন্তু হয় না। জেনিফার বলেন, দোষটা তো ওদের নয়, দোষ মায়েদের। হৈহৈ করে পিকনিক করতে গাজীপুর যেতে পারেন, লঞ্চে করে নৌ বিহারে যান, লাঞ্চ করেন, র‍্যাফেল ড্র খেলেন। শুধু গাঁয়ের বাড়িতে যেতে পারেন না। বাইরে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছে ঝিমলিল, মেঘ, শাওন, টিটো ঘুড়ুর ওরা। ফড়িং প্রজাপতি পাখি না দেখে ওরা বড়ো হচ্ছে।

বলধা গার্ডেন, শিশু পার্কে গেলেই হবে, আমাদের রুট তো গাঁয়ে। আম্মুদের আচ্ছা করে বকে দিয়েছে ম্যাম। বেশ হয়েছে। আমাদের হেল্প না করে তোমরা সারাদিন শাসন করবে। চাপা স্বরে হাসতে থাকে ওরা। বাড়িতে এসে গম্ভীর হয়ে থাকে শিরিন। টিচারের শক্ত কথাগুলো গায়ে খুব লেগেছে। রুট তো আমাদের গাঁয়েই, শিকড়কে কী ভোলা যায়। রাতে খেতে বসেছে সবাই। এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়েছে আম্মু। বলে, সত্যিই তো সবকিছু জানা দরকার। শুধু টেমস নদীকে জানবে, নিজেদের নদী আর পুকুরের কথা জানবে না। তা তো হতে পারে না। এদিকটা কিন্তু ভেবে দেখিনি। ঘুড়ুরের হোমওয়ার্ক কত কিছু শিখিয়ে দিল আমাদের। ড্যাডি হাসিমুখে বলেন, ভাবা উচিত ছিল আমাদের। সে রাতে দুচোখ ভরে ঘুম নামে ঘুড়ুরের। কত যে স্বপ্ন ভেসে আসতে থাকে। বৈঠা বেয়ে কোষা নৌকা নিয়ে যাচ্ছে মাঝি। খুব মিষ্টি করে গান গাইছে। আকাশের মেঘ আর দূরের পাখিরা শুনছে সে গান। পুকুরের হেলেঞ্চা আর কলমী হালকা হওয়ায় দুলে ওঠছে। ব্যাঙাচিগুলো অল্প পানিতে ছুটোছুটি করছে। ঘুমের মাঝে রূপকথার দেশে যেতে থাকে ঘুড়ুর। চাঁদ ভরা রাতে ময়ূরপঙ্খি নাও আর তেপান্তরের মাঠ ঝলমল করে ওঠে। এর সাথে মিশে যেতে থাকে ঝুমুরের খিলখিল হাসি।

গোলাপ

জামিউর রহমান লেমন

আম্নে আঁারে বিশগা ট্যায়া দেন আঁাই আঁ্যাননেরে বেগুন হুল দি দিমু।

এগগো বাই দেন গো। বাইজান কন না আঁ্যার হুল গুন লই যাইতো। বিশ ট্যায়া না খালি, এত্তো হলে তো আই অহনো কিছু বেচতে হারি-ন।

সোনারগাঁ হোটেলের মোড়ে বিরক্তকর যানজটে পড়ে সব গাড়িগুলো আটকে আছে। সবেমাত্র সকাল ন'টা। এরমধ্যে ঢাকা শহরের মানুষগুলো যেন হৈ হুল্লোড় করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। এত গাড়ি যে কোথা থেকে হুড়হুড়িয়ে আসছে তা ভেবেই পায় না টুনি।

ঢাকা শহরে ইদানীং ভ্রাম্যমান হকারের সংখ্যা এত পরিমাণে বেড়ে গেছে যে তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে দুপয়সা আয় করা অনেক কঠিন। আগে টুনি শাহবাগের মোড়ে ফুল বিক্রি করত, সেখানে তার মতো ফুলওয়ালির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সে বেশ কিছুদিন হলো সোনারগাঁ হোটেলের মোড়ে ফুল বিক্রির কাজ করছে। এখানে এত ভিড় না থাকলেও তার মতো আরো তিনচার জন ফুল বিক্রির কাজটা করে থাকে।

এর পাশাপাশি আরো অনেকে পানি, চিপ্‌স, সিগারেট, আচার, লুছনি, তোয়ালে, লেবু, পেয়ারা আরো কত কি বিক্রি করে। দিনে দিনে এই জায়গাগুলো যেন একটা ভ্রাম্যমান বাজারে পরিণত হয়ে উঠেছে। এর পরেও রয়েছে বিভিন্ন কায়দায় ভিক্ষাবৃত্তি।

এমনিতে গাড়ি জ্যামের একটা বিরক্তি এরপর হকার, ভিক্ষুক এদের অত্যাচার সব মিলিয়ে বড়ো বিরক্ত শাহীন দম্পতি। বছর খানেক হলো তাদের বিবাহিত জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী সেখান থেকে পছন্দের বিবাহ। দুজনার ভালো দুটো চাকরি। মোটকথা কেটে যাচ্ছে বেশ ভালোই। মুক্তা শাহীন দুজনে ড্রাইভিং-এ বেশ পাকা। কোনোদিন শাহীন কোনোদিন মুক্তা ড্রাইভিং-এর দায়িত্ব পালন করে। সাংসারিক জীবনে তাদের বোঝাপড়াটা মোটামুটি। সপ্তাহে অন্তত দুদিন রান্নার দায়িত্ব পালন করে থাকে শাহীন, আজো যেমনটি করে এসেছে। মুক্তা ফার্মগেটে একটা বেসরকারি ব্যাংকে কাজ করে আর শাহীন মিরপুরে একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে। দশটার মধ্যে মুক্তার ব্যাংকে পৌঁছানোর তাড়া থাকলেও শাহীনের তেমন একটা থাকে না। কারণ সে যে কোম্পানিতে কাজ করে তার একটি সেকশন প্রধানের দায়িত্ব সে পালন করে থাকে। গতকাল ফেরার পথে ট্রাফিক জ্যামের কারণে রাত ন'টা বেজেছিল প্রায়। ফ্রিজের খাবারটা কোনো রকম ওভেনে গরম করে চালিয়ে নেয় দুজন। আজ অনেক ভোরে ঘুম থেকে উঠে খিঁচুড়ি আর ডিম ভাজা করে নিতে প্রায় ঘন্টা খানেক সময় লেগেছে শাহীনের। মুক্তা ঘন্টা খানেক পরে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে সাওয়ারটা সেরে নিয়ে নাশতার টেবিলে জ্যাম জেলি আর পাউরুটি সাজিয়ে দিতে ভোলেনি। চটজলদি নাশতা সেরে কাজের পথে প্রতিদিনের মতো আজো বেরিয়ে গেছে ওরা দুজন। ইস্কাটন থেকে সোনারগাঁও মোড়ে পৌঁছাতে বিশ মিনিটের ওপর লেগে গেছে। এত বড়ো জ্যামে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না মুক্তা। ব্যাংক বলে কথা। সময়টা সেখানে মুখ্য।

যেভাবেই হোক দশটার আগে পৌঁছাতে হবেই। সাধারণত এরকম জ্যামে পড়লে মাঝে মধ্যে সে নেমে পড়ে। পায়ে হেঁটে বিশ পঁচিশ মিনিটে পৌঁছে যায় ফার্ম গেটে। আজও এরকম কিছু করতে হয় কিনা ভাবছে মুক্তা।

এ্যাগগো আপা আঁ্যাননে কি আঁ্যার হুল গুন নিতেন-ন, নালন গাল দি কইতে হারেন না, আমরা কি ভাসি আইছিনি,

তার সামনে তখন দুইজন ভিক্ষুক অন্যান্য গাড়িতে ভিক্ষা চাইছে, এটা দেখে টুনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে,

চান চান হেতারা তো খরাত করি খায়, তাইলে কন আঁই ভালা না হেতারা ভালা-

মুক্তার ইচ্ছে করছে গাড়ি থেকে নেমে কষে একটা চড় মেরে দিতে- এমনিতেই সময়ের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। তারপর সাত সকালে এত বকবকানি, কার ভালো লাগে। প্রায় চৌদ্দ মিনিট পর হঠাৎ জ্যাম টা ছুটে যায়।

টুনি গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ এক্সিলেটরে চাপ দেওয়ার কারণে গাড়িটা দ্রুত বেরিয়ে আসে। মুক্তা গাড়ির সাইড গ্লাসে দেখল ফুলওয়ালী মেয়েটা গাড়ির ধাক্কায় পড়ে গেছে, তার হাতে থাকা গোলাপের ছড়াগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

ততক্ষণে গাড়ি মোড় পেরিয়ে ফার্মগেটের দিকে রওনা করেছে। ফার্মগেট ওভার ব্রিজের নিচে এসে হঠাৎ গাড়িটা থেমে যায়। স্টার্ট আর নিচ্ছে না।

ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে মুক্তা গাড়ির চাবিটা শাহীনের হাতে দিয়ে বললো

প্লিজ গাড়িটার সমস্যাটা একটু দেখো, আর নয় দশ মিনিট বাকি।

কি আর করা, এমনিতেই সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি, শাহীন তারই প্রয়োজনে অফিস থেকে লোন নিয়ে ছ'লাখে গাড়িটা কিনেছিল। মাসে মাসে বেতন থেকে টাকা কেটে চার পাঁচ বছরে লোনের টাকাটা শোধ হয়ে যাওয়া কোনো ব্যাপার নয়। ঢাকা শহরে একটা গাড়ি যে কি প্রয়োজন, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। কারণ সিএনজি-রিকশার আকাশচুম্বি ভাড়া আর কাস্টমারের প্রতি অবজ্ঞা সব মিলিয়ে মনটা একেবারে বিষিয়ে তোলে। কেনার পর থেকে গাড়িটা মাস ছ'য়েক ভালো চললেও ইদানীং প্রতিমাসে কোনো না কোনো সমস্যা লেগেই আছে। মুক্তা ব্যাংক থেকে কার লোন পেলে একটা সেরকম নতুন গাড়ি কিনে নেবে এরকম একটা সিদ্ধান্ত রয়েছে তাদের। অন্তত বছর পাঁচেক তো নিশ্চিন্তে পার করা যাবে। এরকম হাজারো

কথা ভাবতে ভাবতে এক্সিলেটরে চাপ দিয়ে গাড়ি সচলের চেষ্টা করে চলেছে শাহীন, হঠাৎ গাড়িটা সচল হয়ে যায়। মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে মিরপুরের পথে এগিয়ে যায় শাহীন।

টুনিকে ঘিরে সোনারগাঁ মোড়ে জটলা পড়ে গেছে, কেউবা রাস্তার মাঝে ফুল বিক্রির কারণে টুনিকে বকাঝকা করছে, নির্বিকার ট্রাফিক পুলিশের যেন সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। একজন বয়স্ক গোছের লোক সিএনজি থেকে নেমে টুনিকে টেনে নিয়ে রাস্তার মাঝের আইল্যান্ডের পাশে বসিয়ে দেয়। ব্যস্ত সোনারগাঁ মোড় আরো ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ট্রাফিকের হুইসেল গাড়ির হর্ন সবকিছু ছাপিয়ে টুনির আর্তনাদ কেউ শুনতে পারে না।

টুনি অনেক চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারে না। পায়ের কোথাও কোনো আঘাত নাই রক্ত বের হয় নাই অথচ কি হলো এটা, বুঝে উঠতে পারে না শিশু টুনি।

রাস্তার ওপার থেকে সিটি কর্পোরেশনের সুইপার বিন্দিয়া পুরো জিনিসটি দেখে হৈ হৈ করে দৌড়ে আসে।

এ বেটিয়া এ বেটিয়া তুহার কি হইছে রে-

অ্যাই তো বুঝতা হারিয়েন না, খাড়াইতামও হারিয়েননা মা-

হায় ভগবান তু হামগো মা বললি-রে,

ধীরে ধীরে ব্যাথার প্রচণ্ডতা বাড়ার কারণে টুনি একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। আশপাশের সবাই বিষয়টা লক্ষ করলেও কেউ তাকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেনি। ব্যস্ত সোনারগাঁও মোড় আরো ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, শুধুমাত্র একজন বিন্দিয়ার দৃষ্টির বাইরে বিষয়টি যায়নি।

অনেক ইতস্তত করে বিন্দিয়া টুনিকে রাস্তা পার করে নিয়ে যায়। সোনারগাঁ হোটেলের পাশের ফুটপাতে শুইয়ে পা-টা আলতো করে টানতেই টুনি ব্যথায় কোঁকিয়ে উঠে।

হে ভগবান তু বেটিয়ার পায়ে কি করে দিলি রে-

রে বেটিয়া তু হামাকে মা বুলেছিস যখন, তু ভিন জাত হলেও এই বিন্দিয়া তুহার মা হয়ে গেল আজ থেকে,কি তু হামার বেটি আছিস কি নাই বুলে দে-

আঁার ঠ্যাঙ্গ-এর ভিতর জানি কি অ্যারে

ঠিক আছে ওটা সেরে যাবে-হামি তুহারে ডাক্তার দেখাবে

অ্যাঁর হানি খাইতে মনে কর গো মা-

তুহার কেউ নাহি হ্যায়

দ্যাশে আছে গো মা- হেনী-ছাগলনাইয়্যা,

বাপে আগ্‌গা বিয়া কইছে, মারে ঘরতুন বার করি দিছে, মা মরি গেছে গত বছর, অ্যাঁই রাগ করি চলি আইছি, রমনা হার্কে রাইত অইলে ঘুম যাই, সকাল অইলে শাবাগে ফুল টোকাইতাম যাই, বেচি টেচি ত্রিশ চল্লিশ টিয়্যা যা হাই তা-দি খাই দাই

তুহার মনে বহুত কষ্ট আছে গো বেটিয়া, তু হিয়াসে আরাম করো, হাম আতা হ্যায়

রাস্তার পাশের ল্যাম্পপোস্ট-এর গায়ে ঝুড়ি ও ঝাড়ুটা রেখে বিন্দিয়া চলে গেল।

তখন বেলা গড়িয়ে প্রায় দুপুর, শত শত মানুষ জন ফুটপাত দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে, কেউ কেউ চোখ ফিরিয়ে টুনিকে দেখলেও কোনো সহযোগিতার হাত বাড়ায় না।

এদিকে তেষ্টায় টুনির বুক ফেটে যাচ্ছে। রাস্তার কল থেকে প্রতিদিনের মতো পানি খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও সে যেতে পারছে না। টুনি এভাবে শুয়ে থেকে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

প্রতিদিনকার মতো ব্যাংকে ব্যস্ত হয়ে উঠে মুক্তা। কিন্তু আজ কেন যে তার ভালো লাগছে না কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। বার বার পিছন ফিরে দেখে মনটা আবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এরি মধ্যে কাজ করতে গিয়ে কবার সে ভুল করে ফেলেছে। মাঝখানে মনে হয়েছে আজ ম্যানেজারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে শাহীনের অফিসে চলে যাবে। বাসা থেকে আনা দুপুরের খাওয়াটা না খেয়ে মিরপুরের কোনো রেস্টুরেন্টে ভালো কিছু খেয়ে নেবে।

হঠাৎ মোবাইল টা বেজে ওঠে,

কি খবর-

না এমনিতেই, গাড়িটা তখুনি ঠিক হয়ে গেছিল, আর ডিসটার্ব করেনি-

মনটা ভালো লাগছে না শাহিন-

ঠিক বলেছো আমারও মনটা ভালো নেই, সামনে পুজো সে কারণে কি কোনো-

তোমার সাথে যেদিন মিশে গেছি সেদিন থেকে পুজো কেন, সব ভুলে গেছি-

তাহলে বলো মন খারাপ হওয়ার কারণটা কি-- থাক না ছুটি নিয়ে চলে এসো মিরপুর তেরো তে পরোটা আর শিককাবাব দিয়ে লাঞ্চ করবো- আরে বাবা হাজারটা বাস আছে উঠে পড়লেই হবে, আমি রিসিভ করে নেবো-

একটা ট্যাক্সি নিয়েওতো আসতে পারো-

ভালো, আসছ তো-

ট্রাই করি ফোন দিবো-

সকাল থেকে এ পর্যন্ত তার কাজের মাঝে ভুলের বিষয়টি বলার জন্য মুক্তা ম্যানেজারের রুমে ঢুকলো। সব কিছু শুনে ম্যানেজার বলল

ডেফিনেটলি আপনার সাইকোলজিক্যাল কোনো প্রবলেম হচ্ছে। ইউ গো টু লিভ - অ্যান্ড টেক রেস্ট-

মুহূর্তেই কথা না বাড়িয়ে কোনো দেরি না করে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে মুক্তা একটা ট্যাক্সিক্যাব ভাড়া করল চারশ টাকায়। এক সময় মুক্তা পৌছে গেল মিরপুর।

এদিকে একটা সিএনজিতে করে টুনিকে উঠিয়ে নিয়ে পঙ্গু হাসপাতালের দিকে রওয়ানা দেয় বিন্দিয়া। হাসপাতালের গেইটে পৌছাতেই তাদের জাত ভাইরা দৌড়ে চলে আসে। কারণ মোবাইলে ওখানকার এক সুইপার লিডারকে সে সংবাদটা পৌছে দিয়েছিল। ইমারজেন্সিতে পরীক্ষা নিরিক্ষার পর জানা গেল যে টুনির বাম পায়ে হাড়টা ফেটে গেছে, প্লাস্টার লাগবে, তিনমাস বিছানায় থাকতে হবে। প্লাস্টার লাগবে, ঔষধ লাগবে সব ঠিক আছে, কিন্তু তিন মাস টুনি কোথায় থাকবে, ফুটপাতে, রমনা পার্কের বেঞ্চে! মেথর পট্টিতে তাকে রাখলে তো জাতের অপমান হবে। এই কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে বিন্দিয়া। তিনমাস হাসপাতালে রাখার টাকাও তার নেই। কোনোভাবে এক্সরে ও প্লাস্টারের টাকা পরিশোধ করে আবারো সিএনজি করে টুনিকে নিয়ে সোনারগাঁ-ও হোটেলের মোড়ের দিকে রওয়ানা দিতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল বিন্দিয়ার- উদ্দেশ্য ঝুড়ি ঝাটাটা সেখান থেকে নিয়ে সুইপার পট্টির দিকে যাবে সে, তারপর

ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেবে কি করা যায়।

সারাটা দুপুর ভীষণ খারাপ কেটেছে মুক্তার, কিছুতেই ভুলতে পারছেনা মুক্তা। মুক্তা নিশ্চিত যে এই ঘটনাটি তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

সামান্য কুড়ি টাকা আমি দিতে পারলাম না, গাড়িটা টান দেওয়ার সময় লক্ষ করলাম না শিশুটার অবস্থার কথা। ওকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আমি চলে আসলাম। আমার সামান্য একটা চাকরির কাছে ঐ শিশুটার জীবন তুচ্ছ হয়ে গেল। শিশুটা যদি মারা যায়, তাহলে তার আদালতে আমিই তো আসামী। শাহীন চলো না আমরা একটু ওখানে গিয়ে খোঁজ লাগাই।

তখন বিকেলের অফিস পাড়া ফিরতি মানুষের ভিড়। সব ভিড় এড়িয়ে সকালের ঠিক সেই জায়গাটিতে এসে দাঁড়ায় ওদের গাড়িটি। মুক্তা গাড়ি থেকে নেমেই মোড়ে দাঁড়ানো সার্জেন্ট কে বলল,

হ্যালো, আমি মুক্তা, একটি ব্যাংকের অফিসার, সম্ভবত সকালে আমার গাড়িতে ঠিক ঐখানে একটা ফুল বিক্রেতা শিশু আহত হয়েছে বলে মনে করছি, এরকম কিছু জানেন নাকি-

নিহত তো হতে পারে ম্যাডাম, আসামি সরাসরি এভাবে ধরা দেয় এই প্রথম দেখলাম-

আপনার কথায় আমি দুঃখ পেলাম অফিসার, নিজের সমস্যার কথা ভাবলে তো এখানে খোঁজ নিতাম না, মানুষ একবার ভুল করতেই পারে- দুবার করে না।

সোনারগাঁর ফুটপাতের পাশে এসে দাঁড়াতেই মুক্তা লক্ষ করে যে একটু সামনেই একটা সিএনজি থেকে একজন মহিলা নেমে ল্যাম্পপোস্ট-এর পাশ থেকে একটা ঝুড়ি ও ঝাঁটা নিয়ে আবার সেদিকে এগিয়ে আসছে। কৌতূহল বশত মুক্তা সেদিকে এগিয়ে যায়, কিছু না ভেবেই শাহীন-ও সেদিকে এগিয়ে যায়। মুক্তা দেখে মহিলাটি যে সিএনজি-র কাছে যাচ্ছে তাতে একটা শিশু, তার পা-টা ব্যান্ডেজ করা। মুক্তা দ্রুত সেদিকে এগিয়ে যায়

শোনেন

তু কি হামাকে ডাকছিস

এই মেয়েটার কী হয়েছে- কীভাবে?

কেয়া মালুম, এই বেটিয়া ইখানে ফুল বিক্রি করে, চার পাঁচ মাহিনা ধরে, আজ সকালে একটা গাড়িতে ধাক্কা লেগে উর পাটা ভেঙে গেছে-

কি বলছ-

সাচ বুলেছি-ভগবানের কসম-

আমি কি ওকে দেখব-

কি হবে বোলো, হেই বেটিয়ার তো কেউ লাই, ভগবান উকে দেখবে-

তুমি কি করো-

হামি সুইপার আছি, বহুত ছোটা জাত-

শাহীন আমার জন্য ঐ শিশুটার এই অবস্থা, আমরা ওকে বাসায় নিতে পারি না-

অফকোর্স পারি-

এ সাহাব বেটিয়ার তবিয়ত খারাপ, হামার সুইপার কোলোনিতে তাকে রাখব, তার কাছে ছোটা বড়া সব জাত এক হ্যায়-

একজন সাধারণ সুইপারের কাছ থেকে এ ধরনের কথা শুনে নিমিষেই মুক্তার মনে হলো তাবৎ পৃথিবী যেন তার মাথায় ভেঙে পড়ল।

মুক্তা বিন্দিয়াকে বলল, মাগো পৃথিবীতে সব মানুষ তো এক না, সবাইকে একভাবে মাপতে হয় না, এই ঘটনাটা ঘটেছে আমার জন্য, আমি তাকে আমার বাসায় নিতে চাই, চিকিৎসা করাতে চাই।

তুই ও আমাকে মা বললি বেটিয়া-

বললাম-

চলো আমার সাথে আমার বাসায়,

আমি-

হ্যাঁ তুমিও-

তিনজন ধরাধরি করে টুনিকে গাড়িতে উঠায়, মুক্তা, বিন্দিয়া টুনিকে নিয়ে গাড়ির পিছনে বসে, শাহিন গাড়ির পিছনে ঝুড়ি ও ঝাঁটাটা উঠিয়ে নিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট দেয়। আশপাশের লোকজন বিষয়টা দেখে হাসতে থাকে।

গাড়ির ভিতরে বসে থাকা মুক্তাকে দেখে টুনি চিনতে পারে, ক্লান্ত শরীর তবুও মুচকি হেসে বলে-

আ্যাঁন্নে যদি হেকতে আ্যাঁর গোলাপগুন লইতেন তাহইলে আইজ আ্যাঁর এত কষ্ট হইত না।

এক দুপুরের গল্প

মাহবুব রেজা

দুপুর বেলার ঝাঁজালো রোদ এসে আমাদের জানালায় দাঁড়িয়েছে। জানালার কার্নিশে ধূসর রঙের ছোপ ছোপ দেওয়া দুটো কবুতর বাক-বাকুম শব্দ তুলে একবার জানালার এ মাথা থেকে ও মাথা, আরেকবার ও মাথা থেকে এ মাথা করছিল। পড়ার ঘরে আমি আর আমার বড়ো বোন অঙ্ক করছিলাম। আমার যোগ-বিয়োগ আমি করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মনিরাপা অঙ্ক করার সময় বার বার মাথা চুলকে যাচ্ছিল আর বলছিল, বুঝলি সন্তু, পাটিগণিতের অঙ্কগুলো জটিলেশ্বর স্যারের মতোই জটিল আর কঠিন।

আমি মনিরাপার কথায় অবাক হই, জটিলেশ্বর স্যারের মতো কঠিন আর জটিল-এর মানে কী!

দেখিস না অঙ্কগুলো মেলে না।

ভালো করে অঙ্ক কর, দেখবি সব মিলে যাবে। বলে আমি মনিরাপাকে রাগাবার চেষ্টা করি, একবার না পারিলে দেখো একুশবার–

খুব পাকামি হচ্ছে, না? এক থাপ্পড়ে চাপার বত্রিশটা দাঁত তুলে আনব।

আমি তো তোর মতো পাকু না যে আমার বত্রিশটা দাঁত থাকবে।

তাহলে তোর দাঁত কয়টা?

এই ধরো ছাব্বিশ কী আঠাশটা–

পাকামো না করে অঙ্ক কর– স্যার সন্ধ্যায় এসে হোমওয়ার্ক না পেলে পিঠে তাল পাকাবে।

এমন সময় দরজার বাইরে থেকে ঠক ঠক করে শব্দ উঠল, ঘরে কেউ আছেন? একটু খুলুন না–

মনিরাপা গিয়ে দরজা খুলল। দরজা খুলতেই দেখা গেল বাইরের আলো-বাতাস বন্ধ করে দিয়ে তালগাছের মতো লম্বা এক মানুষ আমাদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার মুখে কদিনের না কামানো দাড়ি-গোঁফ। বেশির ভাগই সাদা চুল উশকোখুশকো। চোয়াল ভাঙা। কিন্তু নাকটা বেশ খাঁড়া।

মনিরাপা লোকটাকে বললেন, আপনি কোত্থেকে এসেছেন? কাকে চান?

মনিরাপার কথায় লোকটা কোনো জবাব দিল না। দরজার বাইরে থেকে লোকটা ঘরের ভেতরে তাকিয়ে আছে। আমি মনিরাপার পেছনে এসে দাঁড়ালাম। আমাকে মনিরাপার পেছনে অমন গুটিশুটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা বললেন- খুকি, তোমার পেছনের ওই ছেলেটা কী তোমার ভাই!

মনিরাপা লোকটার কথায় বিরক্ত হলো কিন্তু প্রকাশ করল না।

কেন?

আরে কেন আবার কী? আমার তো মনে হচ্ছে তোমার ভাই– এতটুকু বলে লোকটা একটু দম নিল। তারপর হাত দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, আর আমার মনে হচ্ছে এই পিচ্চির নামই হলো অপু। অ্যাম আই রাইট? লোকটার চোখে-মুখে রাজ্যের কৌতূহল।

অপু! এ নাম তো আমি জীবনেও শুনিনি। আমার নাম রিদ্য– আর এই লোক কী না বলছে অপু! আমি মনিরাপার পেছনে আগের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মনে হলো, আচ্ছা, লোকটা আবার ছেলেধরা-টেলেধরা না তো!

মনিরাপা লোকটাকে বললেন, আপনি কোত্থেকে এসেছেন তা কিন্তু বললেন না। তারপর মনিরাপা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ও আমার ছোটো ভাই রিদ্য। আপনি কেন ওকে অপু বলছেন।

মনিরাপার কথায় লোকটা শরীর কাঁপাতে কাঁপাতে হো হো করে হেসে বললেন, আরে খুকি তোমার নাম তো দুর্গা, তাই না?

লোকটার কথায় মনিরাপা এবার খুব রেগে গেলেন। বললেন, কতক্ষণ ধরে আপনি রিদ্যকে অপু-অপু করছেন আর এখন আমাকে দুর্গা দুর্গা– এসবের মানে কী?

আমার ভাই জটিলেশ্বর দু-দিন আগে হঠাৎ করে রাতের বেলা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। মারা যাওয়ার আগে আমাকে বার বার তোমাদের কথা বলে বলেছেন, আমি যেন তোমাদের সঙ্গে দেখা করে খবরটা দেই।

কী বললেন, জটিলেশ্বর স্যার মারা গেছেন! স্যার তো গত সপ্তাহে আমাদের পড়িয়ে গেছেন– আপনি এসব কী আবোল-তাবোল বলছেন?

আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, না? চারদিন আগে শরীরে প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে বড়দা দেশে গেলেন। আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করলেন, আড্ডা মারলেন। গ্রামে একটা লাইব্রেরিও করলেন। তারপর একদিন রাতের বেলা কী হলো বুকের ব্যথায়– লোকটা কথাগুলো আর শেষ করতে পারলেন না তার আগেই বাচ্চাদের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে থাকলেন।

মনিরাপা দরজা থেকে সরে গিয়ে লোকটাকে ঘরে ঢুকতে বললেন। লোকটা ঘরে ঢুকল না। রিদ্যকে বললেন, অপু সোনা আমার জন্য এক গ্লাস পানি আনো।

আমি এক দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম। আমার দেখাদেখি মনিরাপাও ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বলল, দেখি মাকে বলে লোকটার জন্য বিস্কুট, চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কী না।

কিছুক্ষণ পর আমি আর মনিরাপা এসে দেখি লোকটা নেই। দুপুরের রোদ দরজার বাইরে খেলা করছে। দরজার বাইরে বারান্দায় গিয়ে দেখি লোকটা আমাদের বসু বাজার লেনের বড়ো রাস্তার শেষ প্রান্তে।

লোকটা যত দূরে যাচ্ছে আমার আর মনিরাপার কাছে ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ছোট্ট থাকার অনেক মজা

আহমাদ স্বাধীন

বড়ো হবার ইচ্ছে মোটেও নেই,
বড়ো হওয়া বেশ ঝামেলার দিক।
ভাবনা বিহীন ছোট্ট থাকাই সুখ,
খুশির আলোয় চারপাশ ঝিকমিক!
ভোর বেলা নেই অফিস যাবার তাড়া
ইশকুলে যাই নিয়ে খাতা বই
বাসায় ফিরেই ইচ্ছে মতো ছুটি
প্রজাপতি- গঙ্গাফড়িং হই!

ইচ্ছে হলেই বালি হাঁসের সাথে
নদীর জলে ডুব সাঁতারে মাতি
কেয়ার ঝোপ আর বেতের বনের পাশে
ডাহুক পাখির ডাকে দু কান পাতি।

অল্প সময় পড়াশোনার চাপ,
বাকি সময় কাটে কেবল খেলায়,
বাবা বলেন সুখি ছিলেন সেও
তার হারানো সেই সে ছোট্ট বেলায়।
এখন বাবা অফিস করেন রোজ
মায়ের হাতেও কাজের তো নেই শেষ
আমার মতো ছোট্ট যারা আছে
আনন্দে রোজ হচ্ছে নিরুদ্দেশ!

যেমন করে মেঘ ভেসে যায় দূরে
সোনালি রং চিল মেলে দেয় ডানা
তেমনি আমি খুশির ভেলায় রোজ
যাই হারিয়ে আকাশের সীমানায়।

সোনা মাখা

রফিকুল ইসলাম রাফিকী

সবুজ ভরা মাঠ ছিল
এখন সোনা ভরা।
ধান পেকেছে স্বপ্নের ক্ষেতে
মনটা আকুল করা।
সবুজ মাঠে ধান পেকেছে
সবার মুখে গান।
খুশির বার্তা ছড়িয়ে গেছে
রবের অশেষ দান।

গাঁয়ে গাঁয়ে উৎসব হবে
নানান রকম পিঠা।
মজা করে খাবো সবাই
লাগবে দারুণ মিঠা।

হাট্টিমা টিম টিম

বাহারুল হক লিটন

হাটটিমা টিম টিম
কোন মাঠে যে থাকে ওরা
কোথায় পারে ডিম?
তাদের শিং দু'টি খুব খাড়া-
দেখলে মানুষ লেজ উঁচিয়ে
করে ভীষণ তাড়া?
হাট্টিমা টিম টিম-
খুঁজতে গিয়ে রক্ত গায়ের
সব হয়ে যায় হিম।
ভয় পেয়ো না খোকন সোনা
হাট্টিমা টিম টিম,
ওরা থাকে বইয়ের পাতায়
খাতায় পাড়ে ডিম।
ওরা হাট্টিমা টিম টিম।

দ্বীপ

মিনতি বড়ুয়া

চারিদিকে সাগর আমার
একটি দ্বীপে বাড়ি
দাঁড়িয়ে আছে অনেক দূরে
পাহাড় সারি সারি।
সে দ্বীপেরই শক্ত মাটি,
আমার অলংকার
এ মাটিতে সোনা ফলাই
দেবো উপহার।
বুনব কত শাকসবজি
করব রোপণ ধান,
ঘরে বসে গাইব এবার
আমার দেশের গান।

স্বর্ণালি সন্দ্বীপ

নজরুল ইসলাম সন্দ্বীপী

চারিদিকে নদনদী ঘেরা
মাঝখানে এক দ্বীপ
সবুজে শ্যামলে ভরা
নাম স্বর্ণালি সন্দ্বীপ।
সাত সকালে লাঙল হাতে
যায় মাঠে চাষি ভাই,
রাখাল বালকের
সোনার কণ্ঠে মধুর গান শুনতে পাই।
দুপুর বেলায় অগ্নি হাওয়ায়
এই দ্বীপেরই লোক
গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে
পায় যে কত সুখ।
রুপসী বাংলার স্বর্ণালি দ্বীপে
লক্ষ লোকের বাস।
সুখে দুখে দিন কাটিয়ে
থাকে বারো মাস।

বাংলাদেশের ফুল

মোহাম্মদ নূর আলম গন্ধী

বাংলাদেশের ফুল
হাজার রকম ফুল
চোখ জুড়িয়ে যায়
রং-রূপের মায়ায়।

বাংলাদেশের ফুল
হাজার রকম ফুল
ছড়ায় গন্ধ-সুবাস
দীর্ঘ বারো মাস।

রং বাহারি রঙের বাহার
কৃষ্ণচূড়ার ডালে
গন্ধরাজে গন্ধ বিলায়
গ্রীষ্ম ঋতুর কালে।

বর্ষামুখর বাদল দিনে
ফোটে কেয়া বকুল
গন্ধমাখা ভর দুপুরে
মনটা হয় যে ব্যাকুল।

শরৎ এলে ফোটে পদ্ম
এবং সাদা কাশ
টগর বেলি শিউলি ফুলে
ছড়ায় মিষ্টি সুবাস।

হিমেল হাওয়া দেয় দোলা
জুঁই চামেলির বনে
তারি সাথে হাসনাহেনা
ফোটে হেমন্তেরই ক্ষণে।

গাঁদা গোলাপ কসমস
হরেক রঙের ডালিয়াতে
ফুলে ফুলে ভরে বাগান
শীত ঋতুর সময়টাতে।

রক্ত রাঙা শিমুল পলাশ
ফোটে গাছের ডালে
প্রকৃতিকে রাঙায় খুব
বসন্তেরই কালে।

আঁকবে চাঁদের রেখা

বজলুর রশীদ

কদম গাছে জোনাক জ্বলে
ঝিঁঝি পোকাও বাজে,
খোকন সোনার ঘুম আসে না
চাঁদ উঠেছে সাঁঝে।

কদম ফুলের সুবাস এবং
আকাশে চাঁদ-তারা,
মায়ের কোলে খোকন সোনা
হলো দিশেহারা।

মায়ের সাথে বায়না ধরে
যাবে চাঁদের বাড়ি,
রকেট গাড়ি কোথায় পাবে?
মায়ের সাথে আড়ি।

মা যে বলে, 'খোকন সোনা'
করলে পড়ালেখা,
বড়ো হয়ে মানুষ হবে-
আঁকবে চাঁদের রেখা।

খোকন যাবে চাঁদের দেশে
স্বপ্ন-আশায় মাতে,
ঘুমের ঘোরে দিলো পাড়ি
চাঁদের বুড়ির সাথে।

চাঁদমুখি

পারভীন আক্তার লাভলী

চাঁদমুখি তোর চাঁদের হাসি
ভীষণ ভালোবাসি
চন্দ্রমুখের স্নিগ্ধ হাসি
চাঁদ আর আমি ভালোবাসি।
চন্দ্রমুখী। সোনামুখী
তুই যে কাঁচা সোনা
নীলাকাশে উড়ে যাব
হাওয়ায় মেলে ডানা।
চাঁদমুখি তোর মিষ্টি হাসি
জগৎ আলো করে
চাঁদমুখি তোর চুমু মায়ের
পরানটা দেয় ভরে।

চাঁদনি রাতে

শাহাদাৎ শাহেদ

যোজন যোজন দূর থেকে চাঁদ
জোছনা ঢেলে দিচ্ছে,
জোনাকিরা সব চাঁদের আলোয়
গা ভিজিয়ে নিচ্ছে।

মিটিমিটি তারাগুলো
জ্বলছে ঝলমলে,
এই সুবিমল আকাশ দেখে
খোকার কী যে হলো!

খোকন খোকন-ডাকছে যে মা
খোকার ঘরে মন নেই,
তার তো এখন ইচ্ছে করে
আকাশ হবার জন্যেই।

আর কী দেরি! অমনি খোকন
দৌড়ে ঘরের বাইরে,
ইচ্ছে ডানার পালকি চড়ে
বলছে আমি যাইরে...

খোকন গেল, আকাশ হলো
তার বুকে চাঁদ-তারাও,
ভীষণ জোরে ধমকে খোকন
বলল সবাই দাঁড়াও...

তার ধমকে থমকে দাঁড়ায়
জিন-পরিদের দল,
জোনাকদেরও ধমকে বলে-
থামাও কোলাহল।

সবাই যখন শান্ত নীরব
পাহাড়গুলো ঘুমে,
খোকন তখন বই পড়ে সেই
চাঁদনি আলোর উমে।

শরতের কবিতা

শরৎ আসে

নীহার মোশারফ

বর্ষা শেষে শরৎ আসে
শুভ্র রঙের খামে
আকাশ থেকে পেঁজা তুলো
হাওয়ায় হাওয়ায় নামে।
আবার ভেসে যায় হারিয়ে
দূরের কোনো দেশে
মনের ভেতর স্বপ্ন হাজার
জমে এসে এসে।
হাসনাহেনার গন্ধ ভারি
সন্ধ্যে থাকে থির
চাঁদের রাতে জোছনা ঝরে
গল্প করে ভিড়।

কাশ বালিকা

আখতারুল ইসলাম

বর্ষা বিদায় মেঘে আড়াল শরৎ রানি এল,
আকাশ-বাতাস মেলছে ডানা সবই এলোমেলো।
রোদের মিছিল মেঘের ডানায় সাদা পরির সাজে,
দূর আকাশের নীলগুলো সব নুইয়ে পরে লাজে।

সাদা পরি নীল চাদরে নেমে আসে দেশে,
বাঁশ বাগানে জোছনা ঝরে হালকা হাওয়ায় ভেসে।
নীল জোনাকির মিটিমিটি পিদিম জ্বলা রাতে,
ঝিঁঝি বসায় গানের আসর নীল পরির সাথে।

শিউলি বকুল হাসনাহেনা ছড়ায় মধুর ঘ্রাণ,
নদীর তীরে কাশ বালিকার ভরে ওঠে প্রাণ।

শরৎ শোভা

সানোয়ার শান্তি

দোল খায় শ্যামা বন দোলে সাদা কাশ
শরতের মেঘ দেখে মেটে না তো আশ
পেঁজা পেঁজা মেঘ দল দূর দেশে ছোটে
শিশিরের রূপ দেখে শেফালিরা ফোটে।

শেফালির ঘ্রাণ মেখে ছোটে হিম বায়
রাতভর ঝরে শিশির তৃণ ঘাসে ধায়
প্রভাতেই আলো জ্বেলে সোনা রঙা রবি
ছোটো ছোটো শিশির কণায় আঁকে মুক্তোর ছবি।

এত রূপ এত শোভা কোথা পাবে বলো
শরতেরই বুক জুড়ে রূপ ঢলো ঢলো।

দেখে এলাম হিমালয়

শাকিরা মারুফ মুগ্ধ

আগামীকাল নেপাল যাবো। আমি খুব আনন্দিত। আমার মনে অনেক ধরনের কল্পনা জাগছে। যেমন নেপাল এমন হবে, সেখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেশ সুন্দর হবে। আমি মনে এরকম চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম খেয়াল নেই। সকালে বাবার ডাকে ঘুম ভাঙল। আমি দ্রুত তৈরি হয়ে নিলাম, ৭টায় বাবার অফিসের গাড়ি এল। গাড়িতে চড়ে আমরা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গেলাম। সেখানে পৌঁছলাম সকাল ৮টায়। সেখানে পৌঁছাবার পর প্রবেশের সময় আমাদের প্রথমে নিরাপত্তা তল্লাশি করা হলো। তারপর আমরা বোর্ডিং পাস নিয়ে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার কাছে গেলাম। ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা একজন নারী, তিনি আমার নেপাল ভ্রমণ যাতে সার্থক হয় তার জন্য শুভকামনা জানালেন। ইমিগ্রেশন কাজ শেষ করে আমরা ওয়েটিং লাউঞ্জে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বিমানে উঠলাম। আমাদের বিমান ছিল জেট এয়ারওয়েজ। আমার ভাগ্য বেশ ভালো। আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল নেপাল, তবে আমরা বাংলাদেশ হতে সরাসরি নেপাল যাওয়ার টিকিট পাইনি। তাই আমরা ঢাকা থেকে দিল্লি হয়ে কাঠমান্ডু গেলাম। আমাদের ভিসা ঢাকা থেকে করা ছিল। কাঠমান্ডুতে পৌঁছে আমরা ইমিগ্রেশন ঝামেলা মিটিয়ে কাঠমান্ডু প্রবেশের অনুমতি পেলাম। এবং সেখানে আমাদের জন্য হোটেলের গাড়ি অপেক্ষা করছিল, আমরা তাতে করে বিশাল রাজপ্রাসাদের মতো এক হোটেল নাম ইয়াক অ্যান্ড ইয়েতিতে পৌঁছলাম। হোটেলটি বেশ সুন্দর দেখে আমি তো একেবারে থ হয়ে গেলাম।

পরদিন আমরা নাশতা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে। আমরা জিপে করে রওয়ানা দিলাম।

মোট জিপ ছিল ১২টি, যেন গাড়ির বহর। কারণ, এখানে আসা একটি কনফারেন্স (জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক)-এ অংশগ্রহণের জন্য ২০টি দেশ থেকে ৬০জন এসেছিল। পুরো দলকে ৬টি গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ৬টি গ্রুপ ৬টি স্থানে যাবে। তবে যাওয়ার রাস্তা একই ছিল বলেই সবাই এক পথেই যাচ্ছিলাম। গোরখা পৌঁছে আমরা একটি রিসোর্ট-এ উঠি। এই রিসোর্টটি খরস্রোতা ত্রিশূলী নদীর পাশে অবস্থিত। সেকি সুন্দর দৃশ্য, নদীর কী স্রোত, শো শো শব্দ দূর থেকে পাওয়া যায় এবং দু'পাশেই পাহাড় আর সামনে পাথরে পাথরে একাকার।

সেখানে একটি পাহাড়ি গ্রামের কিছু লোকজনের সাথে আমরা কথা বললাম, তার আগে তারা পাহাড়ি ফুল দিয়ে আমাদের বরণ করে। তারা আমাদের পাহাড়ের উপরে উঠে একটি জায়গা দেখতে নিয়ে গেল, এরপর বাবা এবং বাবার সহপাঠীরা সবাই গেল পাহাড়েরই অনেক নিচে একটি জায়গা দেখতে। আমি যাইনি, বাবা নিয়ে যাননি পরে উঠতে সমস্যা হবে বিধায়। মাঠ পরিদর্শন শেষে আমরা সবাই গোরখার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম, পথিমধ্যে স্থানীয় এক হোটেলে দুপুরের খাবার খেলাম। রেস্টুরেন্টটির বেশির ভাগ কর্মীই নারী। বিকেলে

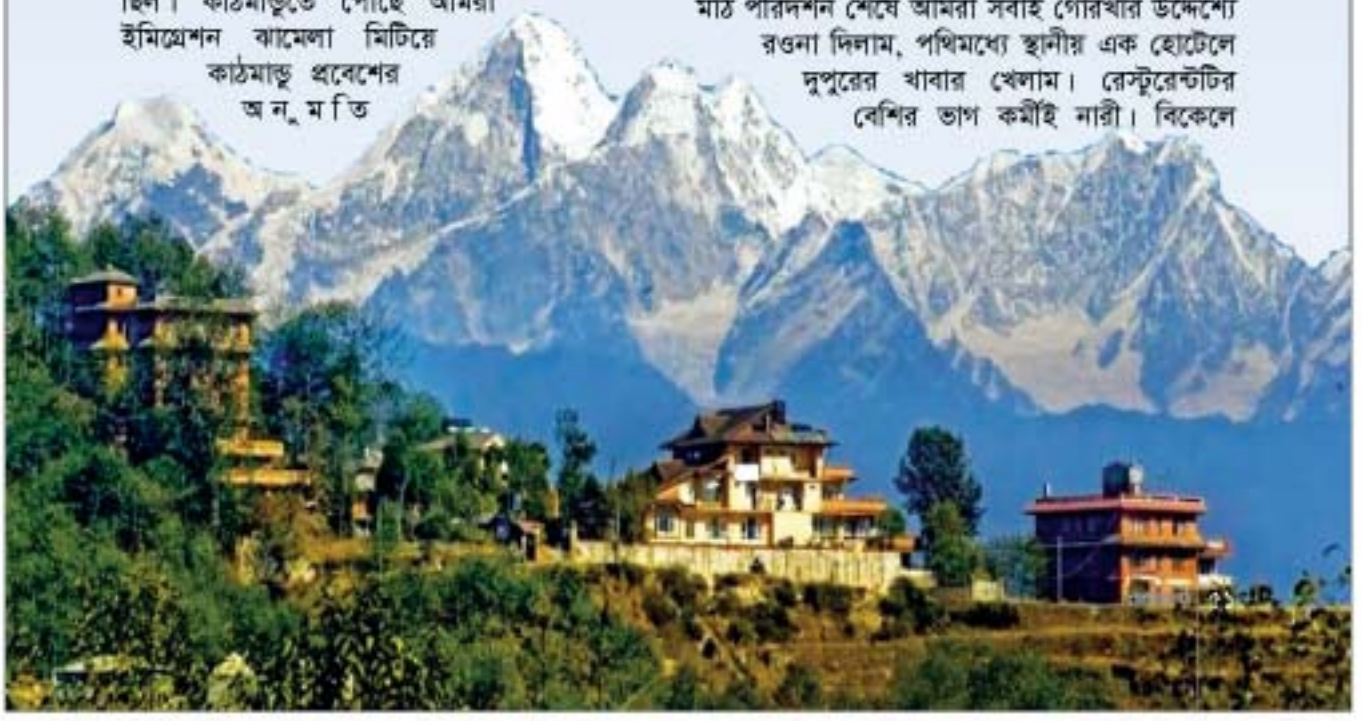

আমরা গোরখা পৌঁছলাম।

আমরা হোটেল বারাহীতে (Hotel Barahi) উঠি। আমার রুমটি ছিল হিমালয়মুখী।

সেখানে আমরা গোরখা লেক ঘুরতে গেলাম। তিনদিকে পাহাড় মাঝখানে লেক, একদিকে হিমালয় দেখা যায়, সে এক অপূর্ব দৃশ্য। লেকের ঠিক মাঝখানে রয়েছে মন্দির (তাল বারাহী মন্দির), দূর থেকে পাহাড়ের উপরে সাদা টেম্পলও (ওয়ার্ল্ড পিস স্টুপা) দেখা গেল। আমরা আশপাশের দোকানগুলো ঘুরে দেখলাম, জিনিসপত্রের অনেক দাম, রাতের খাবার কেএফসি থেকে কিনে আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে গেলাম, কারণ সকাল ৮:৩০ মিনিটে বুড্ডাহ্ এয়ার-এ করে কাঠমান্ডু ফিরব।

ঘুম থেকে উঠে বিছানা থেকেই দেখি হিমালয়, মনটা খুশিতে ভরে গেল। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় হিমালয় ঝকঝক করছিল। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিচে নামলাম এবং বাবার উদ্দেশ্য আমাকে সাদা টেম্পল দেখাতে নিয়ে যাবেন। সময় হাতে খুব কম, বাস বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার আগেই হোটেলে ফিরতে হবে। হোটেলের রিসিপশনে আলাপ করে জানা গেল ফিরে আসতে কমপক্ষে দেড় ঘণ্টা লাগবে। বাবা সিদ্ধান্ত পালটালেন, একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে ফেউয়া ও বেগনেস লেকের পাশ দিয়ে ঘুরতে বললেন। সুন্দর সকালে গোরখা স্থানীয় লোকজন মর্নিং ওয়াক করছিলেন। পরিষ্কার নির্মল সকাল। ড্রাইভার আমাদেরকে একটি সুন্দর জায়গায় নামিয়ে দিয়ে বললেন, এখান থেকে হিমালয় দেখা যায়। দু'পাশে পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি লেকে পড়ছে আর সেখান থেকেই হিমালয় দেখা যাচ্ছে, সে এক অপূর্ব দৃশ্য। লেকের ও প্রান্তে সত্যিই সেই প্রত্যাশিত হিমালয়, আমরা আবারো তা অবলোকন করলাম। এক নেপালি নাগরিককে বাবা অনুরোধ করলেন আমাদের কয়েকটা ছবি তুলে দিতে। তিনি সানন্দে এই দায়িত্ব পালন করলেন। আমরা হোটেলে ফিরে আসলাম, নাশতা করলাম এবং টুরিস্ট বাসে করে আমরা স্থানীয় গোরখা বিমানবন্দরে পৌঁছালাম।

বুড্ডাহ্ এয়ার-এ উঠলাম, আমি দলে একমাত্র শিশু বলে সবাই আমাকে খুব খাতির করত, আমাকে হিমালয়মুখী *[Himalyas from air]*

জানালার পাশে একটি সিট দেওয়া হলো। প্লেন থেকে পুরো হিমালয় দেখলাম, সে এক মনোরম দৃশ্য। এত আনন্দে ছিলাম যে বিমান ক্রু যখন ঘোষণা করল আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে কাঠমান্ডু ত্রিভুবন বিমানবন্দরে নামব তখন পর্যন্ত টের পাইনি। মাত্র ৩০ মিনিটের যাত্রাপথ। আমরা সকাল ১০টার মধ্যে হোটেলে পৌঁছালাম।

দিনের বাকি সময় আমি ইয়াক অ্যান্ড ইয়েতি হোটেলের রুমে কাটালাম। কারণ বাবা কনফারেন্সে ব্যস্ত ছিল, বাবা সন্ধ্যায় এসে আমাকে কনফারেন্স কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিয়ে গেলেন। এরপর সেখানে কিছুক্ষণ থেকে আমরা আবার কিছু কেনাকাটা করতে বের হলাম। স্থানীয় এক লাইব্রেরি থেকে কিছু বইপত্র ও স্যুভেনির কিনে আমরা আবার রুমে ফিরে এসে ঘুমিয়ে গেলাম। তার আগে সারাদিনের ঘটনাবলি সংক্ষিপ্তাকারে লিখে রাখলাম।

বাবা আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিলেন এবং পরদিন দিলেন বাবার প্রিয় নাইকন ক্যামেরা। বললেন তুমি যত পারো ছবি তোলো, আমি ঘুরে ঘুরে অনেক ছবি তুললাম।

বাবার ব্যস্ত সিডিউল থাকার কারণে অনেক উল্লেখযোগ্য স্থান সময় নিয়ে দেখা হয়নি, কিন্তু বন্ধুরা তোমরা যারা নেপাল বেড়াতে যেতে চাও অবশ্যই গোরখা ভ্যালিতে অবস্থিত তাল বারাহী মন্দির, ওয়ার্ল্ড পিস স্টুপা, বিন্দুবাসিনী মন্দির, গোরখা লেকে নৌকা ভ্রমণ, ডেভিস ফল, মহেন্দ্রকেইভ, মাছাপিচ্ছুরি হিমেল, দামপাস-কাসকি, ঘানড্রিক-কাসকি, পুন হিল। সময় এবং সামর্থ্য থাকলে প্যারাগ্লাইডিং এবং জিপ ফ্লাইয়ারে অবশ্যই চড়ে আসবে এবং সে অভিজ্ঞতা অবশ্যই আমাদের সাথে বিনিময় করবে আশা করি।

এ সফরে আমার সবচেয়ে বড়ো অর্জন একসঙ্গে বিশটি দেশের (বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা) ৬০ জনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং তাদের সম্পর্কে অল্প-বিস্তর জানা। এরমধ্যে বিশেষ কয়েকজনের কথা আমার অনেক দিন মনে থাকবে। তারা হলেন-জেনিফার আন্টি (ঘানা), ক্রিষ্ট আংকেল (ভারতীয়) এবং কলিন আন্টি (আমেরিকা) এরা সবাই কর্মসূত্রে আমেরিকা বসবাস করেন। তরুণী কলিন ফারেল ছিলেন এই ইভেন্টের সমন্বয়কারী, তিনি সবসময় আমার বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। তার নেতৃত্ব আমার ভালো লেগেছে। আমি তাদেরকে বাংলাদেশে ফিরে চিঠি লিখেছিলাম।

ষষ্ঠ শ্রেণি, ওয়াই ডব্লিউসিএ, জুনিয়র হাই স্কুল, ঢাকা

করিমুল্লার গাছগুলো

আনিশা রহমান (কথা)

বৃক্ষপুর গ্রামে ছিল একজন গাছ প্রেমী। নাম করিমুল্লা। তার বয়স যখন ২০-২১ বছর তখন একটি বইয়ে গাছ ও গাছের উপকারিতা সম্পর্কে পড়ে তিনি তার বাড়ির চারপাশে নানারকম গাছ লাগান। ফলের গাছ, ফুলের গাছ, ঔষধি গাছ, বটগাছ। তার বাড়িটা ছিল গ্রামটির সবচেয়ে প্রথম ও বড়ো বাড়ি। তাই গাছ লাগানোর জন্য তিনি পর্যাপ্ত জায়গা পান। তিনি সময় পেলেই গাছগুলোর পরিচর্যা করতেন। তার একটি ছেলে ছিল। তিনি তার ছেলেকে গাছ সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলতেন। তিনি বলতেন যে, তিনি মরে গেলেও যেন গাছগুলোর সঠিক পরিচর্যা করা হয়।

করিমুল্লার গাছগুলো তার বাড়িতে ছায়া দিত। ফুলগুলো বাড়ির সৌন্দর্য বাড়াতো এবং দিতো সুঘ্রাণ। ফলের গাছগুলো দিতো ফল। বিভিন্ন গাছ দিতো ঔষধ। তার বাড়ির কিছু দূরে ছিল একটি বড়ো বাগান। সেখানেই তিনি গাছ লাগান। অনেক গাছ হওয়ায় বাগানের গাছগুলো যত্ন নেওয়ার জন্য লোক রাখেন। বাগানটির এক পাশে তিনি সবজির বাগানও করেছেন। বাগানের ফল-ফলাদি নিজেরা খেয়েও বাজারে বিক্রি করতেন। এই দিয়েই তার সংসার চলত।

তার ছেলে শফিক গাছগুলোকে ভালোবাসলেও বাবার মতো একই কাজ করেনি। সে ঢাকায় ব্যবসা করত।

একবার করিমুল্লার বড়ো কোনো অসুখ হয়। কিন্তু চিকিৎসার জন্য টাকা রোজগার করা সম্ভব হয়নি। কেন না শফিক তখন কেবল ব্যবসা শুরু করেছে। অত

বেশি রোজগার তখনো তার হয়নি। যা আয় হতো তা দিয়ে যতটুকু সম্ভব চিকিৎসা করা হলো। করিমুল্লা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেননি। শেষে কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে শফিক বাবাকে বলল, বাবা তোমাকে সুস্থ করতে হলে গাছগুলো বিক্রি করতেই হবে।

করিমুল্লা বলল, না আমি এ গাছগুলো বিক্রি করতে দেবো না। ৩০ বছর ধরে এ গাছগুলো আমার সঙ্গী হয়ে আছে। আর এখন নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য এই গাছগুলো বিক্রি করে দিবো? তাহলে তো আমার বেঁচে থেকে লাভ নেই।

শফিকের আর কিছু করার থাকল না। গাছগুলো বিক্রি না করায় চিকিৎসা হয়নি করিমুল্লার। তার কিছুদিন পরই করিমুল্লা মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি শফিককে বলে যান, গাছগুলো আমাদের অনেক উপকার করে। নিজের সুখের জন্য তাদের কষ্ট দিও না এবং বিক্রি করো না।

করিমুল্লা মারা যাওয়ার পর কয়েক বছর কেটে যায়। এতই লোকসান হয় যে, সে আর ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছিল না এবং বাড়ি ফিরে এল। আগে ব্যবসা অনেক ভালো চলছিল বিধায় বিলাসি জীবন যাপন করত। পূর্বের জীবন বাদ দিয়ে এখনকার কষ্টের জীবনে আর থাকতে পারল না এবং বাবার কথা ভুলে গিয়ে গাছগুলো বিক্রি করে দিল।

কয়েকদিন পর সে লক্ষ্য করল বাড়িঘর কেমন খালি খালি লাগছে। বাড়ির উঠোন ভরা কড়া রোদ। কারণ তখন বৈশাখ মাস। রাতে আবার কালবৈশাখে ঘর নড়াচড়া করে, বাতাসে থাকা যায় না। আগে যে ফল (যেমন আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি) বিনামূল্যে পাওয়া যেত তা এখন আর পাওয়া যায় না। ফুল ছড়ায় না সুঘ্রাণ, বাড়ায় না সৌন্দর্য। অসুখে যে ভেষজ ঔষধ রোগ সারাতো, এখন আর সেই ঔষধ পাওয়া যায় না। বাড়তি ফল-ফলাদি বিক্রি করে আয় রোজগারও করা যায় না।

এসব কথা চিন্তা করে শফিক তার ভুল বুঝতে পারে এবং অনুতপ্ত হয় যে, সামান্য বিলাসিতার জন্য সে তার বাবার কথা অমান্য করেছে, গাছগুলো বিক্রি করে দিয়েছে।

এখন সে আবার গাছ লাগায় এবং প্রতিজ্ঞা করে, তার বাবা করিমুল্লা যেভাবে নিজের চরম বিপদের মধ্যেও গাছগুলো বিক্রি করেনি বরং ভালোবেসেছে, যত্ন করেছে, সেও ঠিক সেভাবে গাছগুলোকে ভালোবেসে যাবে এবং যত্ন করবে।

৭ম শ্রেণি, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

বাংলাদেশ

সাদমান সাকিব

সাকিব, তামিম, মুশফিক, সৌম্য
সবাই ওরা বাংলাদেশের প্রাণ
মাশরাফির সাথে তাল মিলিয়ে
আমি গাই বিজয়ের-ই গান।

টাইগাররা সব জেগেছে আজ
রাখবে দেশের মান
দেশের প্রতি ভালোবাসায়
সবার অনেক টান।

বিশেষ শিশু

ইশকুলে যাই

ফাতেমা জান্নাত

রোজ আমি সেজেগুজে
ইশকুলে যাই
টিফিনের পিরিয়ডে
কত কী যে খাই!

দুষ্টুমি করি যদি
কানমলা পাই
তাই আমি ভালো থাকি
এইসবে নাই।

সপ্তম শ্রেণি, জুলাই আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট।

চাঁদের হাসি

জাহিদ সজল

দিনের শেষে রাত্রি নামে
চাঁদটা উঠে হেসে
হাসির তোড়ে ফুলের সৌরভ
চলছে দেখো ভেসে।

তার হাসিতে রঙিন হয়ে
জুঁই জবারা লাল
হাসির মাঝে নদী বিলে
নৌকো ছাড়ে পাল।

চাঁদের হাসি মন মাতানো
সব ভুলিয়ে যায়
খোকাখুকি তার হাসিতে
সুখটি খুঁজে পায়।

তার হাসিতে জোনাক জ্বলে
নিভুনিভু, বেশ
রাত-গহীনের নীরবতা
ভেঙে করে শেষ !

একাদশ শ্রেণি, দাগনভূঁইয়া একাডেমি, ফেনী।

পাহাড়ি ঝরনা

লাবিবা তাবাসসুম রাইসা

পাহাড়ি ঝরনা ,
দেখেছ কী তার কান্না?
সে তো জানে না
বেশি কান্না ভালো না ।
বেশি কাঁদলে হয়ে যাবে বন্যা
পাহাড়ি ঝরনা।
তাই তার নাম দিয়েছি 'অনন্যা' ।
গভীর গর্তে পেতে পারো মূল্যবান 'পান্না'
সুন্দর একটা ঝরনা
তাই তার নাম দিলাম তামান্না।
দিলাম কিছু তার বর্ণনা
চুপচাপ যায় গড়িয়ে
নিঝুম রাতে নূপুর পায়ে
নেই তার কোনো ভয়
হবে না তো তার ক্ষয়।
সেই পাহাড়ে আমার যে মন পড়ে রয়।

তৃতীয় শ্রেণি, বি, এ,এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা।

আমার লাল সাইকেল

নবনিল আহমেদ

আমি প্রতিদিন সাইকেল চালাই। সাইকেলটি থাকে গ্যারেজে। সেদিন বিকালে গ্যারেজে গিয়ে আমি অবাক। আরে এটা কী। সাইকেলটি নেই! উধাও। সাইকেলটি না পেয়ে এক দৌড়ে বাসায় এলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে মাকে বললাম মা আমার সাইকেলটি নেই। মা বলল নেই মানে? ভালো করে খোঁজ। গ্যারেজেই আছে। তখন আমি কান্না গলায় বললাম, সাইকেলটি চুরি হয়ে গেছে। তারপর আমি, মা-বাবা সাইকেল খুঁজলাম। সারা বিকেল। পাইনি, যার সঙ্গেই দেখা হয় বলে আজ সাইকেল চালাওনি? তখন আরো কষ্ট লাগে। আরো কান্না পায়। তবে চোরটাকে আমি দেখেছি। আমাদের বাড়ির সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখলাম কেমন করে আমার সাইকেল চুরি করে। আমার তখন খুব কষ্ট লাগে। সাইকেলের কথা আমার খুব মনে পড়ে। পাজি চোরটি আমার সাইকেলটি নিয়ে গেল। চোরটাকে একবার পেলে ওকে আমি...।

দ্বিতীয় শ্রেণি, রূপনগর মডেল স্কুল ও কলেজ

বাইসাইকেল তথ্য

- এক চাকায় সাইকেল চালানোর পদ্ধতিকে বলে হুইলি
- তিন চাকার সাইকেলকে বলে ট্রাইক
- স্বশক্তিচালিত যানবাহনের মধ্যে সাইক্লিং হচ্ছে সবচেয়ে কর্মশক্তি সাশ্রয়ী বাহন
- চীনে সাইকেলের সংখ্যা ১০০ কোটি। অথচ আঠারো শতকের পরে সেখানে প্রথম সাইকেল আনা হয়েছিল
- প্রতি বছর প্রায় ১০ কোটি সাইকেল তৈরি হয় বিশ্বে
- ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে জায়গা করে নিয়েছিল বিএমএক্স সাইকেল
- গাড়ি চালানোর চেয়ে বাইক চালাতে মানুষের শারীরিক ও স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বেশি প্রয়োজন হয়
- বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন সাইকেল চালাতে পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, 'জীবন হচ্ছে সাইকেল চালানোর মতো। এতে ভারসাম্য রাখতে চাইলে সামনে এগিয়ে যেতেই হবে।'
- চীনে ছোটো-বড়ো সবার সাধারণ বাহন সাইকেল। তাই এক সময় চীনকে বলা হতো সাইকেলের দেশ।
- অ্যাকসিডেন্ট হলে আরোহীর যেন ক্ষতি না হয় সে জন্য গাড়ির পেছনে এয়ারব্যাগ বসছে
- প্রতি পূর্ণিমায় দক্ষিণ আফ্রিকার সাইক্লিস্টরা কেপটাউনের রাস্তায় দল বেঁধে সাইকেল চালায়। এ অনুষ্ঠানের নাম মুনলাইট মাস
- এক চাকাওয়ালা এবং লম্বা গলাওয়ালা সাইকেলের নাম জিরাফ ইউনিসাইকেল
- বিশেষ ধরনের বাইসাইকেল রিকামবেন্ট বাইক। ২০০ মিটারে এর রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১৩৩.২৮৮ কিলোমিটার।

সহজাত শিক্ষার সহজ পথ

নাজমুল হুদা

বাবার কোলে চড়ে বেশ মজা করে প্যাঁচানো ঝুড়ি ভাজা খাচ্ছে একটি শিশু। ঝুড়ি ভাজায় একটি করে কামড় দেওয়ার পর এক একটি ইংরেজি অক্ষরের মতো দেখাচ্ছে। শিশুটি একগাল হেসে বাবার দিকে তাকিয়ে তা মুখে উচ্চারণ করছে যেমন এ 'ইউ' 'এল'...। বাবাও সম্মতিসূচক হাসি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন কোলের সন্তানকে। কোনো কিছু দেখে অবচেতনভাবে শেখার এই কৌশলকে বলে সহজাত শিক্ষা। শিশু বয়স হলো সহজাত শিক্ষার উপযুক্ত সময়। এ সময় যদি তোমরা চোখ-কান-মন খোলা রাখো তবে জানতে পারবে অনেক কিছু। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সহজাত শিক্ষার কৌশল সহজে আয়ত্ত করতে পারলে তুমি অনেকের চেয়ে এগিয়ে থাকবে। সহপাঠ্য ক্রমিক ও সহজাত শিক্ষা তোমাকে আরো অনেক বড়ো করে তুলতে সাহায্য করবে।

এখন থেকে তোমরাও কাজে লাগাতে পারো এ কৌশল

এক: স্কুলে আসা-যাওয়ার পথটি ধীরে ধীরে রপ্ত করে ফেলো। দেখবে, অনেক কিছু শিখে ফেলেছো, যেগুলো সহজে ভুলবে না। যেমন প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সড়কটি যদি কারো নামে হয় কিংবা সড়কের পাশে যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার অফিস, ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা বা ভাস্কর্য থাকে- খেয়াল রাখো। পরে বড়োদের কাছ থেকে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নাও। রিকশা বা গাড়িতে বসে ক্লাসের বই পড়ে চোখ ও মস্তিষ্কের উপর বাড়তি চাপ না দিয়ে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে শেখার অভ্যাস তৈরি কর। এভাবে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখতে ও শিখতে পারলে অল্পদিনেই তুমি অনেকের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে যাবে।

দুই: স্কুলে গিয়ে শুধু ক্লাশের পড়াশোনায় মশগুল থেকো না। এর বাইরেও জানার আছে অনেক কিছু। যেমন তোমার স্কুলের নাম ও মনোগ্রামের বিশেষত্ব, প্রতিষ্ঠাকাল, ইতিহাস খুঁটিনাটি ধীরে ধীরে জেনে নাও। এগুলো জানার আগ্রহ তৈরি করতে পারলে অবচেতনভাবেই অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের তথ্যও সহজাতভাবে তোমার নজরে আসবে, সহজেই জানা হয়ে যাবে। এছাড়া স্কুলের খেলাধুলা, বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে যত দ্রুত সম্ভব যুক্ত হয়ে যাও, পুরস্কার না পাও কিন্তু জানতে পারবে অনেক কিছু।

তিন: বাসায় পড়াশোনার চাপ না থাকলে চুপটি মেরে বসে থেকো না বা টেলিভিশন দেখে বেশি সময় নষ্ট করো না। বাইরের ভালো বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন পড়ার আগ্রহ তৈরি করো। প্রতিদিনের পঠিত গল্প বা খবরের সাথে উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যক্তি, স্থান বা আগ্রহের বিষয় চোখে পড়লে সেগুলো আলাদা রেখে পরে ভালোভাবে পড়ে বা শুনে বিস্তারিত জেনে নাও। দেখবে, ধীরে ধীরে তোমার মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে।

চার: নিত্য ব্যবহার্য সবকিছুতেই শেখার উপাদান আছে, চেষ্টা করো সেগুলো তৎক্ষণাৎ জেনে নেওয়ার। যেমন- দাঁত ব্রাশ করার টুথপেস্টে, গায়ে মাখার তেল, সাবান কী কী উপাদানে তৈরি তা প্যাকেট বা কৌটা দেখে কৌতূহলী দৃষ্টিতে পড়ে ফেলো, মগজে গেঁথে যাবে। এমনকি লেখার সময় কলমের কালি কেন নিচের দিকে নামে, কাঠ পেন্সিলে কীভাবে লেখা হয় এগুলোর ব্যাখ্যাও জেনে নাও। এতে তোমার দৈনন্দিন বিষয় বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, মেধা শাণিত হবে।

পাঁচ: বাবা-মা, শিক্ষক বা বন্ধুদের সাথে কোথাও বেড়াতে গেলে শুধু ছবি তুলে সময় নষ্ট করো না। নতুন ও নান্দনিক বিষয়গুলো উপভোগ করতে শেখো। বাসায় ফিরে ভালো লাগার স্থানের বর্ণনাও লিখে রাখতে পারো এতে তোমার লেখার দক্ষতাও বাড়বে। বড়ো হয়ে তুমি যা-ই হতে চাও না কেন এই সহজাত শিক্ষা কৌশল তোমাকে অনেকখানি এগিয়ে রাখবে ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার মাধ্যম

নিরক্ষরতা বিশ্বের সার্বজনীন সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে পৃথিবীর সব দেশ থেকে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালের ৮-১৯ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর উদ্যোগে ইরানের তেহরানে 'বিশ্ব সাক্ষরতা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের প্রস্তাব করা হয়। পরে ১৯৬৫ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ৮ সেপ্টেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে জাতিসংঘ, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ থেকে শুরু করে বিশ্বের দাতা সংস্থা, বিভিন্ন দেশের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে এ দিবসটি পালিত হচ্ছে। সাক্ষরতা বলতে সাধারণত অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নতাকে বোঝানো হলেও বর্তমানে এর সংজ্ঞা ব্যাপক। এর সঙ্গে জীবনধারণ, যোগাযোগের দক্ষতা ও ক্ষমতায়নের দক্ষতাও এর সাথে যুক্ত আছে। তাই দিবসটি পালনের যথাযথ গুরুত্ব রয়েছে।

সাক্ষর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য অন্তত ৩টি শর্ত মানতে হয়। ১. ব্যক্তি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোটো বাক্য পড়তে পারবে, ১. সহজ ও ছোটো বাক্য লিখতে পারবে এবং ৩. দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ হিসাব-নিকাশ করতে পারবে। এই প্রত্যেকটি কাজই হবে ব্যক্তির প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। বর্তমানে সারা বিশ্বে এই সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে সাক্ষরতার হিসাবনিকাশ করা হয়। ১৯৯৩ সালে ইউনেস্কো এই সংজ্ঞাটি নির্ধারণ করে।

সাক্ষরতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবীয় অধিকার

হিসেবে বিশ্বে গৃহীত হয়ে আসছে। এটি ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক ও মানবীয় উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এমনকি শিক্ষার সুযোগের বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভর করে সাক্ষরতার ওপর। সাক্ষরতা মৌলিক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে। দারিদ্র্য হ্রাস, শিশুমৃত্যু রোধ, সুষম উন্নয়ন

এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রেও সাক্ষরতা প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। পৃথিবীর সব মানুষকে নিজেদের অন্যতম মৌলিক অধিকার শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই মূলত এই দিনটির প্রচলন হয়েছে। একটু লক্ষ করলে দেখা যায় যে দেশে সাক্ষরতার হার বেশি সে দেশ উন্নয়নে এগিয়ে। সাক্ষরতা আর উন্নয়ন দুটোই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। সাক্ষরতাই টেকসই সমাজ গঠনের মূল চালিকাশক্তি। টেকসই সমাজ গঠনের জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তা একমাত্র সাক্ষরতার মাধ্যমে অর্জন সম্ভব।

এই দিবস পালনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন দেশের প্রতিটি শিশু শিক্ষিত হোক। তাঁর স্বপ্ন পূরণে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রকল্পের সুফল পড়তে শুরু করেছে সামগ্রিক শিক্ষার ওপর। তাইতো কন্যাশিশু ও নারী শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে 'শান্তি বৃক্ষ' প্রদান করে ইউনেস্কো। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিক এক একটি জনসম্পদ। অপার সম্ভাবনাময় এই জনসম্পদকে শিক্ষিত, নৈতিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারলেই হবে দেশের উন্নয়ন। সাক্ষরতা শান্তি স্থাপনেও অবদান রাখে এবং মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করে। বঞ্চিত এবং নিরক্ষর শিশু-কিশোর ও যুবকদের শিক্ষার মাধ্যমে দেশের জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। বাংলাদেশকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকর রাষ্ট্র তৈরি করতে হলে নিরক্ষরদের সাক্ষরজ্ঞানে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে শুধু সরকার নয় যার যার অবস্থান থেকে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে- সচেতন করে তুলতে হবে সমাজকে।

তাহলেই দেশ একদিন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবে। অচিরেই শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যান্য দেশের জন্য রোল মডেল হবে।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

নারীর ক্ষমতায়ন: কন্যাশিশুর সাফল্য

সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে খন্দকার আলিজা হোসেন

একটি মেয়ে সাইকেল নিয়ে পুরো মাঠ প্রদক্ষিণ করছে। চারদিক থেকে হর্ষধ্বনি ও হাততালি ভেসে আসছে। যারা সাইকেল চালাতে জানে না অথবা চালানোর ইচ্ছা ছিল না কোনোকালে, তাদেরও মনে প্রশ্ন জাগছে- 'আমিও যদি সাইকেল চালাই, অসুবিধা কোথায় বরং সুবিধাই বাড়বে'। নবারুণের বন্ধুরা, তোমাদের নিশ্চই জানতে ইচ্ছে করছে- যে সাইকেল চালাচ্ছে সে কে, কারা হাততালি দিচ্ছে, কোথাকার ঘটনাইবা এটি। চলো বন্ধুরা জেনে নিই।

'নারীর ক্ষমতায়নে বাল্যবিয়ে রোধ' স্লোগানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জামাতা খন্দকার মাশরুর হোসেন মিতু ও নাতনি খন্দকার আলিজা হোসেনের উপস্থিতিতে সিরাজগঞ্জে মাধ্যমিক স্তরের ৬০০ কিশোরী শিক্ষার্থীর মাঝে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের আয়োজনে ৩ আগস্ট সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে সাইকেল বিতরণ করা হয়।

সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠান শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রীর নাতনি উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সামনে সাইকেল চালিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীরা এতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং অনুপ্রাণিত হয়।

সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রফেসর হাবিবে মিল্লাত মুন্নার আমন্ত্রণে সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর জামাতা সিরাজগঞ্জবাসীকে আনন্দে ভাসান।

আমাদের মীনাদের জন্য মিনা দিবস

মীনা একটি উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত ও সাহসী মেয়ের নাম। ঠিক আমাদের নবারুণের বন্ধুদের মতো। কার্টুন চরিত্রে মীনার বয়স নয় বছর।

লিঙ্গ বৈষম্য রোধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও শিশু নিরাপত্তার গুরুত্ব নিয়ে মীনা কার্টুনের গল্পগুলো তৈরি হয়েছে। যৌতুককে না বলা, বাল্যবিবাহকে না বলা,

'নারীর ক্ষমতায়নে বাল্যবিয়ে রোধ' স্লোগানে সিরাজগঞ্জে মাধ্যমিক স্তরের ৬০০ নারী শিক্ষার্থীর মাঝে সাইকেল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর জামাতা খন্দকার মাশরুর হোসেন মিতু এবং নাতনি খন্দকার আলিজা হোসেন।

ছেলে ও মেয়ে সন্তানকে সমান গুরুত্ব দেওয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, শিশুর ডায়রিয়া হলে করণীয়, মেয়েদের নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখা, গৃহকর্মীদের ওপর নির্যাতন রোধ ও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এ কার্টুন প্রচারিত হয়। কার্টুনটি বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি ও নেপালি ভাষায় সম্প্রচার করা হয়েছে।

শিশুদের অধিকার রক্ষার সচেতনতা বাড়াতে ১৯৮৯ সাল থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর মীনা দিবস পালিত হয়ে আসছে। সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের সহায়তায় ইউনিসেফ প্রতি বছর জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ভিত্তিক ও কমিউনিটি পর্যায়ে মীনা দিবস পালন করে। এ দিবস উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে র‍্যালি, মীনা বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, যেমন খুশি তেমন সাজো ইত্যাদি কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস

শিশু অধিকার রক্ষাকল্পে ১৯৫৪ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক এক প্রস্তাবে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর একদিন 'শিশু দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর ২৯ সেপ্টেম্বর 'শিশু অধিকার দিবস' পালিত হয়ে আসছে। কন্যাশিশুর প্রতি লিঙ্গবৈষম্য রোধে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু বিকাশের বিষয়টিকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ২০০০ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি সরকারি আদেশের মাধ্যমে শিশু অধিকার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনকে 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। তখন থেকেই প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বর দিবসটি পালিত হচ্ছে।

কন্যাশিশু ও নারীকে অবজ্ঞা, বঞ্চনা ও বৈষম্যের মধ্যে রেখে কখনোই একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ে উঠতে পারে না। এই বাস্তবতায় পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে সমসুযোগ ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নারী ও কন্যাশিশুর শিক্ষার বিকাশ অত্যন্ত জরুরি।

সরকার বিগত বছরগুলোতে কন্যাশিশু ও নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন নারী বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলসমূহে নারী শিক্ষার্থী অনুপ্রবেশ এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। শিক্ষা কন্যাশিশুর উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশুমৃত্যুর হার কমানোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

শিশু একাডেমি থিয়েটার

অবাক জলপান

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা সুকুমার রায়কে নিশ্চয়ই চেনো। তিনি একজন বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক। শুধু তাই নয়, তিনি একাধারে ছড়াকার,রম্যরচনাকার ও নাট্যকার। শিশুদের জন্য তিনি লিখেছেন মজার মজার গল্প, কবিতা, ছড়া। তারই একটি জনপ্রিয় রচনা 'অবাক জলপান'। প্রায় শত বছর আগে সুকুমার রায় এটি রচনা করেন। বিভিন্ন সময়ে বড়োদের অভিনয়ে এ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে। এবার বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অংশ 'শিশু একাডেমি থিয়েটার' -এর প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হলো নাটকটি । আর এই নাটক দিয়েই যাত্রা শুরু করল 'শিশু একাডেমি থিয়েটার'। তবে চমৎকার বিষয়টি হলো, প্রথমবারের মতো সব শিশুশিল্পীদের অভিনয়ে মঞ্চস্থ হলো 'অবাক জলপান'। শিশুশিল্পীদের অনবদ্য অভিনয়ে মুখর ছিল পুরো মঞ্চ। মূলত শিশুদের মাঝে নাট্যচর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য থেকেই গড়ে উঠা শিশু একাডেমি থিয়েটার।

'অবাক জলপান' নাটকে এক পথিকের পানির তৃষ্ণাকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে গল্প। পথিক বড্ড তৃষ্ণায় কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- মশাই, একটু জল পাই কোথায়, বলতে পারেন? উত্তরদাতা চটজলদি উত্তর দিলেন, 'জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এখনতো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম নিতে চান দিতে পারি ...'। তারপর এক বৃদ্ধ লোকের কাছেও জল চেয়ে উলটাপালটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয় পথিক। এরপর এক কবির কাছে জল পানের কথা বললে ও সেও পথিককে জল খাওয়ানোর পরিবর্তে মেতে ওঠে জল নিয়ে জল কবিতা রচনায়। অবশেষে সে যায় এক বিজ্ঞানীর কাছে। ওই বিজ্ঞানী জল খাওয়ানোর পরিবর্তে জলের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্কের ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করে। এই যেমন, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। নানান কথা। সর্বশেষ বুদ্ধি খাটিয়ে ফন্দি এঁটে পথিক বিজ্ঞানীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জল পান করে। হাস্যরসে ভরা, তবে শিক্ষণীয় একটি নাটক। নাটকটি নির্দেশনা দেন মাসুদ রানা।

গত ৩১ জুলাই ২০১৭ সন্ধ্যা ৬টায় শিশু একাডেমি মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় শিশুতোষধর্মী এ নাটকটি। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন শিশু একাডেমির পরিচালক আনজীর লিটন। তাছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন দেশের বরেণ্য নাট্যজনেরা।

শিশু একাডেমি কর্তৃপক্ষ জানায়, সারা দেশে শিশুর একাডেমির শাখা অফিসগুলোর মাধ্যমে শিশু নাট্যকর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১১ ফেব্রুয়ারি প্রথম পর্যায়ে ১১০টি শিশু নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে ছয় সদস্যবিশিষ্ট নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষকদের নিয়ে একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সব সদস্যই একপর্যায়ে অডিশনের ভিত্তিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি ৪০ জন শিশু নাট্যকর্মীকে নিয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি থিয়েটার গঠন করা হয়। সেখান থেকে ফাইনাল অডিশনের মাধ্যমে নির্বাচিত ২৮ শিশুশিল্পী নিয়ে মঞ্চায়িত হয়েছে 'অবাক জলপান' নাটক। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাদমান সারার জায়ান, ইয়ারির ইবনে আমিন, জান্নাতুল ফেরদৌস মীম, ওয়ামিয়া বিনতে ফারুক জিদনী, সৈয়দা নাবিলা হক, আবরার তাসিন; এদের মতো শিশুশিল্পীরা। আগামী দিনগুলোতে শিশুদের নিয়ে একাডেমির আরো বড়ো পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ। তাই বন্ধুরা, তোমরাও শিশু একাডেমির বিভিন্ন কার্যক্রমে ইচ্ছা করলে অংশগ্রহণ করতে পারো।

প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে

মিনহাজুল আবেদীন সিয়াম, তৃতীয় শ্রেণি, নাখালপাড়া হোসেন আলী উচ্চ বিদ্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

সমৃদ্ধি বিশ্বাস শ্রেয়সী, নার্সারি শ্রেণি, চারুপাঠ হাতেখড়ি স্কুল, মিরপুর, ঢাকা

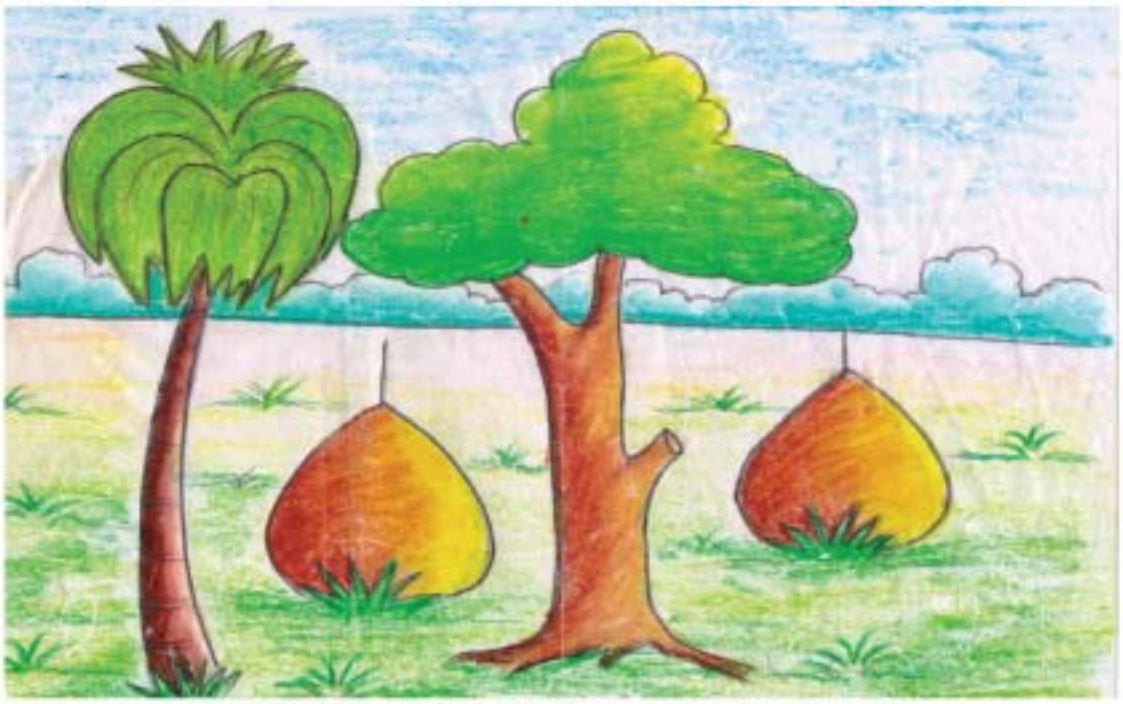

বনি হাওলাদার, ষষ্ঠ শ্রেণি, এসিলাহা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট

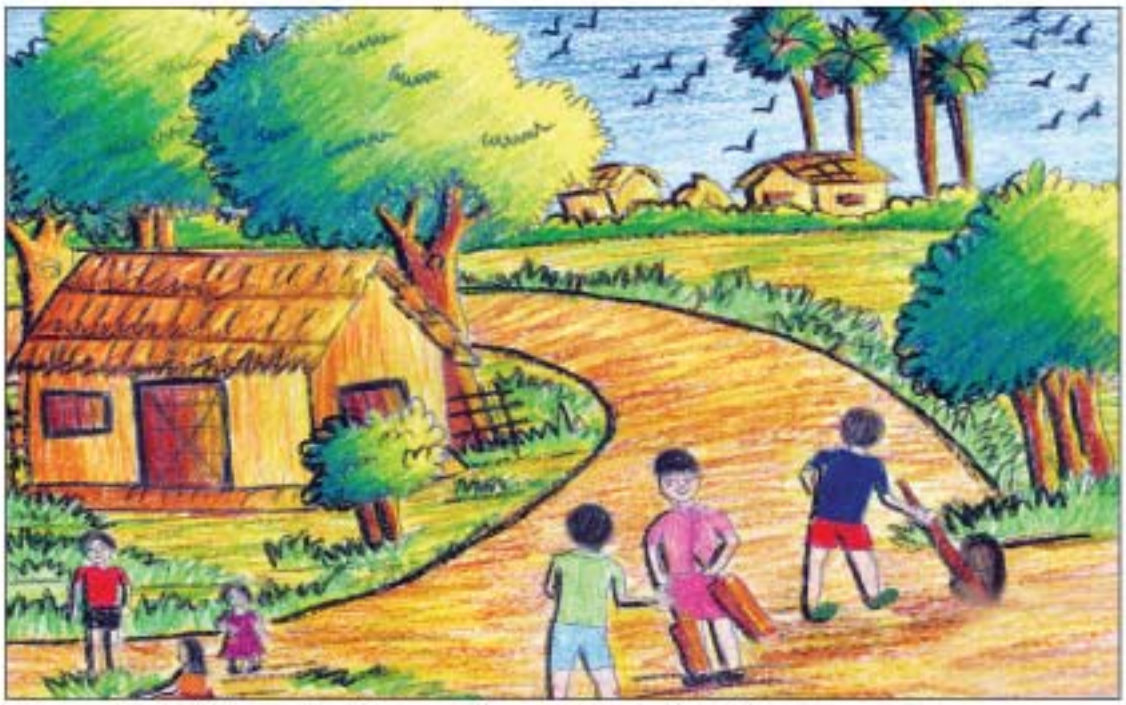

মরিয়াম চৌধুরী জয়িতা, ষষ্ঠ শ্রেণি, রাজবাড়ি সরকারি উচ্চবালিকা বিদ্যালয়

রামিছা নুজহাত খান, দ্বিতীয় শ্রেণি, স্কলার্সহোম
স্কুল অ্যান্ড কলেজ, পাঠানটুলী, সিলেট

নিখিল দাস, চতুর্থ শ্রেণি, রেলওয়ে স্কেভেঞ্জার্স সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাঁদপুর

মাকনুন মুরছাহা, শ্রেণি- এসটিডি-৩, রামু ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল, কক্সবাজার

ইসরা তাসকিন অস্মিতা, ষষ্ঠ শ্রেণি, আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়

শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

উদ্যোগ ১
একটি বাড়ি একটি খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

বন্ধুরা, আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। তাদের শহরের মানুষদের থেকে বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। ফলে তারা আর্থিকভাবে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই তো প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করার জন্য 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই তো এই বিপ্লবের মূল সুর হলো–'দিন বদলের স্বপ্ন আমার, একটি বাড়ি একটি খামার'। পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন–এই ভিশন নিয়ে কাজ করছে প্রকল্পটি। এ প্রকল্পের সাথে ১ জুলাই ২০১৬ সালে যোগ হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। এ ব্যাংকের ৪৯% অংশ মালিকানা হলো প্রকল্পের উপকারভোগীগণ।

অর্জনসমূহ

এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ৪০ হাজার ২১৪ টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গড়ার মাধ্যমে ২১ লাখ ৯০ হাজার ৭২ জন উপকৃত হয়েছে। তোমরা আরো জেনে খুশি হবে, এর মাধ্যমে নিম্ন আয়ের পরিবারের সংখ্যা নেমে এসেছে ৩%-এ। যা আগে ছিল ১৫%। প্রকল্পভুক্ত এসব পরিবারের আয় বৃদ্ধি বছরে গড়ে ১০ হাজার ৯২১ টাকা। যা অভূতপূর্ব এক সাফল্য। বন্ধুরা, তোমরা আরো জেনে অবাক হবে, এ প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় ১ কোটি ২২ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় অধিক আয়ের পরিবারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১%, আগে যেখানে ছিল ২৩%।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বন্ধুরা, এ প্রকল্পটি দারুণ কিছু লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ করে যাচ্ছে এবং আগামীতে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পটি দারিদ্র্য সীমার আওতায় দারিদ্র্যের হার ২২ শতাংশ থেকে ১৮.৬ শতাংশে নিয়ে আসা এবং ২০২০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য সীমার নিচের ১ কোটি পরিবারকে প্রকল্পের আওতায় এনে দারিদ্র্যকে শূন্যের কোঠায় আনার রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। লিজকৃত খাস পুকুর, ডোবা, খালে মাছ ও হাঁস চাষের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আঙিনায় নিচু জায়গা ভরাট করে সবজি, ফলজ ও ঔষধি গাছ রোপণের ব্যবস্থাসহ বসতবাড়িতে বিভিন্ন দুর্যোগ সহনীয় করার জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।